Registered

মূল্য ঃ দুই টাকা

এক

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পরিচিত বিপ্লবী সূত্রগুলোকে অর্থহীন জপমন্ত্রের মত মুখস্থ করে আউড়ে চলা এবং প্রতিপদে বাস্তব পরিবেশকে অগ্রাহ্য করে বৈপ্লবিক সংগ্রামের নামে অতি বামপন্থার দিকে গিয়ে আন্দোলনকে বানচাল করে দেওয়ার যে প্রবণতা তারই নাম ডগ্‌মাটিজম-সেক্‌টারিয়ানিজম।

—ত্রিদিব চৌধুরী

গণবার্তা

সূচি..... পৃষ্ঠা

সম্পাদকীয় ১

কেন্দ্রে বিজেপি সরকার সর্বনাশা ১

দেশে বিদেশে ২

নন্দীগ্রাম ৩

লকডাউন, আমফান ও বামপন্থী গণসংগঠনগুলির ভূমিকা ৫

আকাশবাণী সম্প্রচার এবং দূরদর্শন সম্প্রচারে নির্বাচনী প্রচারের ছবি ৬-৭

৮

68th Year 32th Issue ★ Kolkata ★ Weekly GANAVARTA ★ Saturday 3rd Apr. 2021

সম্পাদকীয়

কম ও বেশি অপশক্তির তত্ত্ব প্রতিক্রিয়ার হাতকেই শক্ত করে

সংযুক্ত মোর্চা এবারের বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি'র রাজনৈতিক লক্ষ্যের মধ্যে মৌলিক ফারাক না থাকার কথা বলেছিল। দু' দফার নির্বাচনে সেই ব্যাখ্যাটাই অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হয়েছে। টি এম সি সুপ্রিমো বনাম দেশের প্রধানমন্ত্রীর বাক্‌যুদ্ধ চরম অপসংস্কৃতির স্তরে নেমে গেছে। আর্থিক সংকট, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, আমফান ইত্যাদিতে বিপর্যস্ত রাজ্যের মানুষকে বাধ্য হয়ে কর্পোরেট প্রচার মাধ্যমের বিষ গলাধঃকরণ করতে হচ্ছে। তৃতীয় যে গণতান্ত্রিক বিকল্প শক্তি নিপীড়িত নিম্নবর্গের মানুষের, অধিকাংশ নাগরিকের, ছাত্র শিক্ষক মহিলাদের বঞ্চনার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে, দুটি দলের অর্থের স্রোতের বিরুদ্ধে মাথা তুলে রাজনৈতিক লড়াইয়ে শামিল হচ্ছে, তাকে গণমাধ্যমে ব্ল্যাক আউট করার প্রচেষ্টা টি এম সি এবং বিজেপি'র সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। সাধারণ মানুষের কাছে এই বিপন্নতা, আর্থসামাজিক পরিসরে এই বিপর্যয় শুধু একাংশ সাধারণ নাগরিকদেরই বিভ্রান্ত করছে না। বুদ্ধিজীবী শিল্পী সাহিত্যিক নাট্যকর্মীদের একাংশ, যাঁরা নিজেদের প্রগতিশীল বামপন্থী ঘরানার ভাবপ্রবণতায় আপ্লুত, তাঁরাও নিজেদের অবস্থান সম্বন্ধে দ্বিধাগ্রস্ত, বিভ্রান্ত এবং দিগ্‌ভ্রষ্ট। তাঁরাও সম্ভবত অস্বীকার করেন না যে, কেন্দ্রের ফ্যাসিস্ট শাসকদল অতিশয় দ্রুততার সঙ্গে দুর্নীতি, সামাজিক, সাংস্কৃতিক আধিপত্য এবং অর্থনৈতিক আগ্রাসনের ত্রিভুজের গণ্ডীতে সমগ্র দেশবাসীকে বন্দি করে ফেলেছে। রাজনৈতিক সন্ত্রাসে শুধু মাত্র রাজনৈতিক বা সামাজিক কর্মীরাই নন, শিল্পী সাহিত্যিকরাও রাষ্ট্রিক নিপীড়নে বাকরুদ্ধ। পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোর সহযোগী যে উদার বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ঐতিহ্য নির্মিত হয়েছিল, সেই মঙ্গলকামী রাষ্ট্রের কাঠামো দ্রুত আগ্রাসী নয়া উদারবাদের দ্বারা বিলুপ্ত হওয়ার ফলে উদার মূল্যবোধও ধ্বস্ত। কুসংস্কার, সাম্প্রদায়িকতা, অপবিজ্ঞান, উগ্রখণ্ডিত পরিচিতি সত্তা সমাজকে কলুষিত করছে।

পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা আরও জটিল। গত দশ বছর ধরে দুর্বৃত্ত অধ্যুষিত দক্ষিণপন্থী দল টি এম সি রাজ্যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ধ্বংস করেছে। শুধু তাই নয়, সংসদে অনেকগুলি জনবিরোধী আইন পাশ করাতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে বিজেপি'র পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। বলাবাহুল্য, রাজ্যবাসীর মৌলিক সমস্যাগুলি সম্পূর্ণ অবহেলিত। অথচ বুদ্ধিজীবীরা যে ডিমিট্রভের যুক্তফ্রন্টের তত্ত্ব উপস্থাপিত করছেন, তার বিকল্পে ক্লারা জেটকিনের সেই ঐতিহাসিক বক্তব্য অবশ্যই ভুলে গেছেন। 'এই অপ্রধান অপশক্তির তত্ত্ব শুধু প্রতিক্রিয়ার শক্তিকেই মদত দেয় না। জনগণের নিরাসক্ত নিস্পৃহতাও বাড়িয়েও তোলে'। জার্মানীতে হিটলার চ্যান্সেলারের পদ একরকম রাষ্ট্রপতি হিন্ডেনবুর্গের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়ার পর অন্যান্য বুর্জোয়া দলগুলিও নাৎসীদলের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যায়। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোটিও ধ্বংস হয়। ইতিহাস থেকে অভিজ্ঞতা গ্রহণ করতে গেলে ঐতিহাসিক পরম্পরাও অবশ্যই স্মরণীয়। এছাড়া প্রাক্তন বামপন্থীদের একাংশ এখনও তৃণমূল সুপ্রিমোকে জনপ্রিয়তাবাদী নিম্নবর্গের নেত্রী রূপে দেখে বিজেপি'র বিকল্প তৃণমূলকে সমর্থনের জন্য উদ্‌গ্রীব। টি এম সি'র তুলনায় তাঁদের কাছে নাকি এখনো বামপন্থীরা বেশি প্রতিক্রিয়াশীল।

এই সব বিক্ষিপ্ত বাম শক্তির কাছে সময়ের ডাক গিয়ে পৌঁছোয় নি বলেই আমাদের ধারণা। দেশের এই বিপর্যয়ের কালে যেভাবে রাজ্যে ক্ষমতা দখলের উদগ্র বাসনায় দুটি দলের মধ্যে সর্বনাশা প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে, তাতে আমরা নিঃসন্দেহ যে, শুধুমাত্র মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, অঢেল অর্থের স্রোত আর গিমিকের মাধ্যমে জনগণের সংগ্রামী শক্তিকে নিস্পৃহ করে ফ্যাসিবাদী শাসনতন্ত্র সুদৃঢ় করাই এদের লক্ষ্য। তাই এই সব দিগ্‌ভ্রান্ত বামশক্তি এবং বুদ্ধিজীবীদের কাছে আমাদের প্রত্যাশা, সময়ের ডাকে সাড়া দিয়ে এই দুটি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে পরাস্ত করুন। এক কঠিন বাস্তবতার মধ্যে যে খেটে খাওয়া মানুষের বিকল্প যুক্তফ্রন্ট গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে, তাকে শ্রেণিসংগ্রাম অভিমুখী ফ্যাসিবিরোধী যুক্তফ্রন্টে উন্নীত করুন।

কেন্দ্রের বিজেপি সরকার সর্বনাশা

ভারতের স্বাধীনোত্তরকালে সর্ব নিকৃষ্ট সরকার হিসেবে সাধারণের ঘৃণা ও প্রতিরোধের মুখে মোদী সরকার এবং তৃণমূল কংগ্রেস

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্বাচন শুরু হয়ে গেছে। গত ২৭ মার্চ এবং ১৩ এপ্রিল যথাক্রমে ৩০ এবং ৩১টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়াও সমাপ্ত। আগামী ৬ এপ্রিল তৃতীয় দফার ভোটগ্রহণ ৪১টি কেন্দ্রে। তারপর ১০ এপ্রিল ৪৪টি কেন্দ্রে। এভাবেই মোট ২৯৪টি কেন্দ্রের ভোটগ্রহণ চলবে ২৯ এপ্রিল পর্যন্ত। দীর্ঘ একমাস দুইদিন ধরে মোট আট দফায় রাজ্যের ভোটগ্রহণ চলবে। আগামী ২ মে ভোট গণনা হলে শেষ হবে এই প্রক্রিয়া। রাজ্যের মানুষ বুঝতে পারবেন কাদের হাতে এই রাজ্যের ভবিষ্যৎ অন্ততপক্ষে আগামী পাঁচ বছরের জন্য ন্যস্ত হবে।

পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে উত্তর-পূর্ব ভারতের অসমে বিধানসভা নির্বাচন। সুদূর দক্ষিণাত্যের তামিলনাড়ু, পুডুচেরী এবং কেরল রাজ্যেরও ভোট প্রক্রিয়া চালু রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মতো এমন দীর্ঘমেয়াদি ভোটগ্রহণ আর কোথাও হচ্ছে না। কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের অভিমত, আমাদের রাজ্যই সর্বাধিক হিংসাপ্রবণ। এরাজ্যে এক বা দুই দফার ভোটগ্রহণ হলে অবাধ এবং সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়। এমন অভিমত সম্পূর্ণভাবে খণ্ডন করা কঠিন। দুর্ভাগ্যজনক হলেও বিগত দিনে বিধানসভা, লোকসভা এমনকি, রাজ্যের ত্রিস্তর পঞ্চায়েতগুলির নির্বাচনের অভিজ্ঞতা বেশ খারাপ। খুন, জখম, মারামারি, বুথ দখল বা প্রতিপক্ষের ভোটপ্রার্থীদের নিরুপদ্রবে মনোনয়ন দাখিলের সুযোগও অনেক ক্ষেত্রে ছিল না। সুতরাং লজ্জাজনক হলেও রাজ্যবাসীকে এই কলঙ্ক মেনে নিতেই হচ্ছে।

এই প্রতিবেদন লেখার সময় নির্বাচনী প্রচার বেশ উত্তুঙ্গ শিখরে, মূলধারার সংবাদ মাধ্যমগুলি প্রায় প্রথম থেকেই পরিকল্পনা মাফিক 'বাইনারি' বা দ্বিপাক্ষিক প্রচারের মাধ্যমে রাজ্যের আমজনতাকে বোঝানোর চেষ্টা করে যাচ্ছিল, হয় তৃণমূল কংগ্রেস নতুবা বিজেপি! অঢেল অর্থ ব্যয় করে এই দুটি দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল দল বামপন্থীদের অবস্থানকে প্রথম থেকেই অবহেলা করে প্রচারের আলো থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন। ভাবখানা এমনই যে, পশ্চিমবঙ্গের মতো এক রাজ্যে বামশক্তি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে। বস্তুত আগ্রাসী এবং গভীর সংকটগ্রস্ত পুঁজিবাদ যেকোনো ভাবেই হোক সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ পোষিত নয়াউদারবাদের বিরোধিতা করার অপরাধে বামপন্থী রাজনৈতিক শক্তিকে তাচ্ছিল্য করার পথই নিয়েছে। বামপন্থীদের উত্থাপিত প্রসঙ্গগুলি যা, রাজ্য এবং দেশের সাধারণ মানুষের জীবনে গভীর তাৎপর্য বহন করে তা যেন মানুষের কানে না পৌঁছাতে পারে, সেজন্য সুচারু ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এতসব গভীর চক্রান্তমূলক ব্যবস্থা নেবার পরেও বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের প্রচারকে পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া হয়নি। তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি প্রাত্যহিক খেউর কিংবা অশালীন বাক্য বিনিময়ের আসরগুলির পাশাপাশি শত চেষ্টা করেও মানুষের কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করে রাখা আদৌ সম্ভব হয়নি। বামপন্থীরা সেই কাজটিই নিষ্ঠাভরে করে চলেছে। এখনও পর্যন্ত বহুধরনের বাধাবিপত্তি উপেক্ষা করেই বামপন্থীরা দৃঢ়তার সঙ্গে পথে রয়েছেন। প্রায় সর্বত্রই সাধারণ মানুষ তাঁদের স্বাগত জানাচ্ছেন এবং সহযোগিতা করছেন। এই বৈশিষ্ট্যটি বিগত বেশ কয়েক বছর সেভাবে লক্ষ্য করা যায় নি। বামপন্থীদের মিটিং মিছিলে সর্বত্রই নজরকাড়া ভিড়। সাধারণ মানুষ নিজেদের পকেট থেকে খরচ করে পালে পালে চলে আসছেন বামপন্থী নেতা কর্মীদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং কথা শুনতে। এটা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে হচ্ছে। ভোটের ফলাফল কি হবে তা, নির্দিষ্টভাবে অনুমান করা সম্ভব নয়। উচিতও নয়। বাজারি ভোট সমীক্ষাগুলিকে তেমন গুরুত্ব না দেওয়াই সমীচীন। তবে উল্লেখ করা যায় যে, বামপন্থীদের নেতৃত্বে যে সংযুক্ত মোর্চা গড়ে উঠেছে তা, যথেষ্ট শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে। কেউ কেউ হয়তো বেশি আশাবাদী হয়ে এবারের নির্বাচনে সংযুক্ত মোর্চার জয় নিশ্চিত বলে উল্লেখ করছেন।

প্রকৃতপক্ষে দেশ ও রাজ্যের অধিকাংশ মানুষই বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেস অথবা বিজেমূল সম্পর্কে বিশেষ বিরূপ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। অদূর অতীতে করোনা অতিমারীকালে দেশ ও রাজ্যের সরকারগুলির ন্যক্কারজনক ভূমিকা সম্পর্কে সকলেই বিশেষভাবে অবহিত। তাঁরা বুঝেছেন যে, ভারতীয় জনতা পার্টি যারা, উগ্র হিন্দুত্ববাদী ফ্যাসিবাদ আশ্রিত ভাবাদর্শে পরিচালিত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের অঙ্গুলি হেলনে চলে তাদের পক্ষে শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে কোনো পদক্ষেপ বস্তুত অসম্ভব। তৃণমূল কংগ্রেসও এক অর্থে আর এস এস এরই অনুসারী। এই উভয় রাজনৈতিক অপশক্তিই জনসমাজকে জাতের নামে বা ধর্মভাষা আঞ্চলিকতা প্রভৃতির নামে বিভক্ত করতে উন্মুখ। দক্ষিণপন্থী এই দুটি দলের অপশাসনে দেশের বড় বড় পুঁজিমালিকদের প্রভূত পরিমাণে সুবিধা হয়ে চলেছে। বিশেষ করে বলা যায় যে, বর্তমান সময়ে দেশ চালাচ্ছে আম্বানি আদানির মতো ব্যবসায়ীরা। কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত নীতি ও সিদ্ধান্তগুলি একান্তভাবে এইসব কর্পোরেট কোম্পানিগুলির ব্যবসায়িক সুযোগ সুবিধা আরও অবারিত করার লক্ষ্যেই ধাবিত।

নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বর্তমান এন ডি এ বা মোদী সরকার স্বাধীনোত্তর ভারতে নিকৃষ্টতম ও সর্বাধিক অত্যাচারী এক সরকারের তকমা পেয়ে গেছে। এমন দুঃসময় ভারতে আর কখনও

এরপর ৪-এর পাতায়

চিন এবং ইরানের মধ্যে ২৫ বছরের জন্য ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হল

২৭ মার্চ চিন এবং ইরানের মধ্যে ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। আপাতত দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতার এই চুক্তির মেয়াদ ২৫ বৎসর। এই চুক্তি অনুযায়ী চিন ইরানে ৪০০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে, পরিবর্তে ইরান চিনকে নিরবচ্ছিন্নভাবে তেল সরবরাহ করবে।

ইরানের পরমাণু প্রকল্প নিয়ে চলমান আন্তর্জাতিক বিতর্ক এবং নিষেধাজ্ঞার পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে এই চুক্তির বাস্তবায়ন নিয়ে সংশয়ের অবকাশ আছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ইরানের সঙ্গে ২০১৫-র পারমাণবিক চুক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য ইরানের কাছে বার্তা পাঠিয়েছেন। এখনও ইরানের পক্ষ থেকে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়নি। ইরানের দাবি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রথমে তাদের একতরফা ভাবে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে। এই নিষেধাজ্ঞা ইরানের অর্থনীতিকে প্রায় পঙ্গু করে ফেলেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ যে পাঁচটি দেশ ইরানের সঙ্গে পারমাণবিক চুক্তিতে স্বাক্ষর দিয়েছিল চিনও এই পাঁচ দেশের একটি দেশ ছিল।

শনিবার ২৬ মার্চ তেহরানে বিদেশমন্ত্রকের কার্যালয়ে চিন ও ইরানের বিদেশ মন্ত্রীদ্বয় এই চুক্তিতে স্বাক্ষর দিয়েছেন।

দশকের পর দশক মধ্যপ্রাচ্যের অর্থনীতি এবং রাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান ভূমিকা চিন ও ইরানের মধ্যে সহযোগিতার এই চুক্তি হয়ত বেশ খানিকটা খর্ব হতে পারে এমনটাই অভিমত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের। আগামী ২৫ বছর ধরে ৪০০ বিলিয়ন ডলারের এই চুক্তির আওতার মধ্যে থাকবে ব্যাঙ্ক ব্যবসা, বন্দর, স্বাস্থ্য পরিষেবা, তথ্য প্রযুক্তি ইত্যাদি প্রায় একগুচ্ছ বিষয়। চুক্তির খসড়াতে সামরিক সহযোগিতা, যৌথ প্রশিক্ষণ, অস্ত্র উৎপাদনে উন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণা ইত্যাদি বিষয়গুলিও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

তালিবান এবং আফগান সরকারের মধ্যে ভাগাভাগি

তালিবান এবং আফগান সরকারের মধ্যে ভাগাভাগি না হওয়া পর্যন্ত মার্কিন সেনাদের আফগানিস্তান ছেড়ে চলে আসাটা বাঞ্ছনীয় নয়। তালিবান এবং আফগান সরকারের মধ্যে বিতর্কের অবসান না হলে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের দু এক বছরের মধ্যে গোটা দেশটাই তালিবানদের নিয়ন্ত্রণে চলে যেতে পারে বলে বাইডেন প্রশাসনকে মার্কিন গোয়েন্দা দপ্তর সতর্ক করেছে। এমতাবস্থায় আল কায়দাও নতুন ভাবে আফগানিস্তানে প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্যে বিশেষ উদযোগ গ্রহণ করবে।

প্রসঙ্গত, বাইডেনের পূর্বসূরি ট্রাম্প আফগানিস্তান থেকে যত শীঘ্র সম্ভব সেনা প্রত্যাহারের চেষ্টা করছিলেন, বাইডেন কিন্তু সেক্ষেত্রে বেশ সাবধানী পদক্ষেপই সম্ভবত গ্রহণ করতে চলেছেন।

অবশ্য রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের অভিমত, অনির্দিষ্টকালের জন্য আফগানিস্তানে মার্কিন সেনাদের উপস্থিতি ঐ দেশের নিজস্ব নিরাপত্তা বাহিনীকে পঙ্গু করে ফেলবে, কাবুল এবং শহরাঞ্চলের কয়েকটি জায়গা ছাড়া তালিবানদের তাদের প্রভাব বিস্তার এবং ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করবে।

মায়ানমারে সেনা বাহিনীর তাণ্ডব

মায়ানমারে সামরিক অভ্যুত্থানের পর সামরিক বাহিনীর মারাত্মক আক্রমণে ২৭ মার্চ, শনিবার ১০০ জনেরও বেশি বিক্ষোভকারী নিহত হয়েছেন। সামরিক অভ্যুত্থানের পর এক দিনে সামরিক বাহিনীর হাতে নিহত হওয়ার এটা এক রেকর্ড। প্রত্যক্ষদর্শী এবং সংবাদ মাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী ২৭ মার্চ শনিবার মায়ানমারের ইতিহাসে এক রক্তাক্ত দিন। মায়ানমারে উপস্থিত ব্রিটিশ এবং মার্কিন সরকারের প্রতিনিধিরা একবাক্যে সেনাবাহিনীর প্রতিহিংসার তীব্র নিন্দা করেছেন।

সেনা অভ্যুত্থানের প্রতিবাদে দেশের সর্বত্র এখন এক অরাজক অবস্থা। কেন্দ্রীয় প্রশাসন কার্যত অচল। শনিবার সেনাবাহিনীর হত্যালীলার প্রতিবাদে ইয়াঙ্গন, মান্দালয় এবং অন্যান্য শহরগুলিতে কাতারে কাতারে মানুষ রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। গত এক মাসে প্রায় ৪৫০ জন সেনাবাহিনীর হাতে প্রাণ দিয়েছেন।

সেনাবাহিনীর সাফাই, গত নির্বাচনে আউ সাং সুচির দল অবৈধ উপায়ে নির্বাচনে জয়ী হওয়ার প্রতিবাদেই নাকি তারা ক্ষমতা নিজেদের আধিপত্যে আনার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রসঙ্গত, অশান্ত মায়ানমারে সেনাদিবস উদ্‌যাপনের কুচকাওয়াজে গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে এখনও পরিচিত ভারতও অংশগ্রহণ করেছে। স্বৈরতন্ত্র বিরোধী মায়ানমারে জনতার প্রতিবাদী আন্দোলনের সম্ভবত কোনও গুরুত্বই নেই ভারতের বর্তমান শাসকশ্রেণির কাছে। কার্যত মায়ানমারের সেনা অভ্যুত্থানকে সমর্থন করছে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে পরিচালিত ভারত সরকার।

বিশ্বের বেশির ভাগ গণতন্ত্রই মায়ানমারের সেনা শাসনের তীব্র সমালোচনা করেছেন। ভারতের সঙ্গে ১৬০০ কিলোমিটার লম্বা সীমান্ত রয়েছে মায়ানমারের। সীমান্তবর্তী রাজ্য মিজোরামের সঙ্গে মায়ানমারের বহু পরিবারের পারিবারিক সম্পর্ক ছাড়াও ঐ দেশের সঙ্গে নাগাল্যান্ড, অরুণাচল প্রদেশ, মণিপুরের মানুষের দীর্ঘকালের পারিবারিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক রয়েছে। পারিবারিক বন্ধনের খাতিরেই সেনাশাসনে নিগৃহীত মায়ানমারের বহু মানুষ ভারতে আশ্রয় পেয়েছে। অথচ শরণার্থীর বোঝা না বাড়াতে তৎপর ভারত সরকার। শরণার্থী অনুপ্রবেশ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের নির্দেশ জারি করেছে। এদিকে সেনার তরফে হত্যালীলা অব্যাহতই। নিরস্ত্র প্রতিবাদী জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে সেনাবাহিনী গ্রেনেড লঞ্চার পর্যন্ত ব্যবহার করেছে।

বাংলাদেশের মৌলবাদীরা উস্তাদ আলাউদ্দিন খানের বাড়ি পোড়াল

দেশে বিদেশে সর্বত্রই মৌলবাদীদের চরিত্রে কোনও পার্থক্যই নেই। ৩০ মার্চ ভারতে হিন্দুত্ববাদের বর্তমান পুরোহিত নরেন্দ্র মোদীর বাংলাদেশ সফরের বিরোধিতা করে বিক্ষোভ ও হরতালের মধ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বহু বাড়ি ঘরের সঙ্গে উস্তাদ আলাউদ্দীনের বাড়ি এবং প্রদর্শনশালা পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে মৌলবাদীরা। কট্টর মৌলবাদী সংগঠন হেফাজতে ইসলামিক কর্মীরা উস্তাদ আলাউদ্দীনের বাড়িতে হামলা চালিয়ে তাঁর প্রিয় সরোদ, তবলা, কয়েকশো বই পুড়িয়ে হিন্দুস্থানি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অমূল্য প্রদর্শনশালার বড় সর ক্ষতি করেছে।

অসত্য ভাষণে কোনও ট্যাক্স দিতে হয় না

নির্বাচন উপলক্ষ্যে আমাদের এই রাজ্যটিতে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী যুযুধান দলগুলির অনর্গল অসত্য ভাষণে মনে হয় যেন অসত্য ভাষণের সুনামি চলছে সারা রাজ্যে। লকডাউনের ধাক্কা ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের উপর কি ধরনের ক্ষতি ঘটানো যেতে পারে তারই নিত্যনতুন পথের সন্ধান দিয়ে চলেছেন নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বর্তমান ভারত সরকার। বিগত যৌবন ভারতীয় গণতন্ত্র আজ বিলাসদ্রব্যের মতোই সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে, এই গণতন্ত্রের কফিনে আর গুটি কয়েক পেরেক ঠোকার কাজ বাকী আছে মাত্র। করোনা অতিমারি এক বিশেষ সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করে মোদী সরকার গত এক বছরে কৃষি বিল সহ একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ বিল সংসদে পাশ করিয়ে নিচ্ছে। বিরোধীদের আপত্তি শুনবার বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনার দায়িত্ব ক্ষমতাসীন সরকারের হলেও বর্তমান সরকার সেই দায়িত্ব পালনে আগ্রহী হবে এমন আশা না করাই ভাল। সদ্য অনুমোদিত দিল্লি বিল, এর আগে জম্মু কাশ্মীর বিলের মতো গণতন্ত্রকে ভুলুণ্ঠিত করে ফ্যাসিবাদী জমানা কায়েম করার লক্ষ্যে আরও অনেক বিলই আইনানুগ করার জন্য সংসদকেই ব্যবহার করা হবে, যা এখনই হলফ করে বলা যেতে পারে।

করোনা সমাচার

১ এপ্রিল করোনার দৈনিক মৃত্যুতে আমেরিকাকে ছাপিয়ে ব্রাজিল শীর্ষে পৌঁছাল। এক ব্রাজিলীয় সাংবাদিক বলেছেন—ব্রাজিলে অক্সিজেনের অভাবে দমবন্ধ হয়ে বহু মানুষ মারা যাচ্ছেন। মার্চ মাসে গত মার্চের (২০২০) তুলনায় দ্বিগুণের বেশি মানুষ ব্রাজিলে প্রাণ হারিয়েছেন। ৬৬,৫৭৩ জন মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন এই মার্চেই। এখন পর্যন্ত গোটা বিশ্বে মোট ২৮ লক্ষ করোনায় মৃতের মধ্যে কেবল আমেরিকাতে মৃতের সংখ্যা ৫ লক্ষ ৬৫ হাজার, ব্রাজিল দ্বিতীয় স্থানে ৩ লক্ষ ২১ হাজার। বহু দেশেই টিকাকরণ বন্ধ বা ধীরগতিতে চলছে। পাশাপাশি নতুন নতুন স্ট্রেনের আবির্ভাব উদ্বেগ ও আতঙ্ক বাড়িয়ে তুলছে।

নতুন স্ট্রেনের ধাক্কায় ইউরোপে সংক্রমণ রোজই বাড়ছে। ফ্রান্সে নতুন করে করোনা নিয়ন্ত্রণে কড়াকড়ি শুরু হয়েছে। সাময়িক ভাবে স্কুল বন্ধের ঘোষণা হয়েছে। দেশের কিছু কিছু অংশে লকডাউন হতে পারে, ম্যানুয়েল ম্যাকরোঁ বলেছেন, সারা দেশে সম্পূর্ণ লকডাউন না করে কিভাবে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করা যায় সেই ভাবনাচিন্তা করতে হবে।

ঐতিহ্যের সঙ্গে সংগতি রেখেই ভারত সরকারের দুই নম্বর মানুষটি সম্প্রতি এই রাজ্যে নির্বাচনী প্রচারে এসে এক ঝুড়ি মিথ্যার বেসাতি করে গেলেন। এই মানুষটি বলে গেলেন আমফানের ত্রাণ বাবদ রাজ্যকে ১০,০০০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। অদ্যাবধি যে হিসাব পাওয়া গিয়েছে তা অবশ্য এই দাবির এক তৃতীয়াংশ মাত্র। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রাজ্যের আমফান বিধ্বস্ত এলাকায় হেলিকপ্টারে পরিদর্শনের পর ১০০০ কোটি টাকা সাহায্যের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং এই ঝড়ের আরও ছ' মাস পর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক আরও ২,৭০৮ কোটি টাকা দিয়েছিল। বাকী (১০০০০ — (১০০০ + ২৭০৮) = ৬২৯২ টাকা তাহলে কোথায় গেল? একি সত্যিই হিসাবের ভুল। না কি ইচ্ছাকৃত অসত্য ভাষণ।

প্রশ্ন হল, যদি সত্যিই এই বিপুল পরিমাণ টাকা যথাস্থানে না পৌঁছিয়ে বেহাত হয়ে থাকে তাহলে এত দিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী করছিলেন কী? জনগণের টাকা এভাবে নয়ছয় করার মারাত্মক অভিযোগ জনগণের গোচরে না এনে নির্বাচনী জনসভায় প্রকাশ করার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অপেক্ষায় ছিলেন কেন এতদিন?

আশঙ্কা মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যা বলেছেন, তা নির্বাচনী প্রচারের জন্যই বলেছেন। সত্যের নাম গন্ধও নেই। বিপন্ন মানুষের প্রতি অসংবেদনশীলতা কোন পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে তারই এক নিদর্শন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ভাষণে পাওয়া গেল।

ঠুঁটো জগন্নাথ

সদ্য অনুমোদিত 'The Government of National Capital Teritorry of Delhi (Amended) Bill এর মাধ্যমে কার্যত দিল্লির নির্বাচিত সরকারকে ঠুঁটো জগন্নাথে পরিণত করার চক্রান্ত সফল হতে চলেছে। উপরাজ্যপালের হাতেই সব ক্ষমতা অর্পণের হদিশ রয়েছে এই বিলে। এরপর দিল্লির সরকার-এর বাস্তব কোনও অস্তিত্বই রইল না। জনগণের দ্বারা নির্বাচিত দিল্লির সরকারকে সর্বক্ষেত্রেই উপরাজ্যপালের পরামর্শ অনুযায়ীই চলতে হবে। নতুন আইনে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর পদটি আলঙ্কারিক। উপরাজ্যপালকে সামনে রেখে কেন্দ্রীয় সরকারের মর্জিমাফিক দিল্লি চলবে।

নন্দীগ্রাম : আবার সে এসেছে ফিরিয়া

তুষার চক্রবর্তী

যত রকম ফন্দি
আজ নন্দীগ্রামে বন্দি
তোরা, ভয় পাসনে আর—
ওদের বোতাম টিপেই মার
(ফন্দীগ্রামে বাদ্যি বাজে,
তুষার চক্রবর্তী)

এই লেখা যখন লিখছি তখন চলছে তীব্র উত্তেজনার পরে, নন্দীগ্রামের গ্রামপ্রধান বিধানসভা নির্বাচনী এলাকায়, আধাসন্ত্রস্ত, আধা উত্তেজক পরিস্থিতির মধ্যে ভোটগ্রহণ পর্ব। সকলেই জানেন, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী নিজের দক্ষিণ কোলকাতা ভবানীপুর কেন্দ্র ছেড়ে নন্দীগ্রামে প্রার্থী হয়েছেন। আর, তাঁর দল তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে, ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগ দিয়ে তাঁকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছেন নন্দীগ্রামে জমি আন্দোলনের আর এক প্রধান চরিত্র—শুভেন্দু অধিকারী। উত্তেজনার আগুন না জ্বালালে অবশ্য তৃণমূল সুপ্রিমোর পেটের মুড়ি হজম হয় না। তাই সারা সকাল নিজেকে গৃহবন্দী রাখলেও, পয়লা এপ্রিলের দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে, উত্তেজনার আগুন পোহাতে তিনি পাক্কা দু' ঘণ্টা ধর্না দিলেন বয়াল নামের এক হিন্দুপ্রধান গ্রামের একটি মক্তব স্কুলের ভোটকেন্দ্রে। তাঁকে দেখে বা তাঁর আবির্ভাবের আগাম বার্তা পেয়ে অকুস্থলে অবিলম্বে জড়ো হল তৃণমূল ও বিজেপি'র দুই সাম্প্রদায়িক প্রতিপক্ষ। নাটকীয় পরিস্থিতি তৈরি করে নিজেকে সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রচারের কেন্দ্রে তুলে ধরতে এই চিত্রনাট্য রচিত হয়েছিল। নন্দীগ্রামের নাম ও জমি আন্দোলনের খ্যাতিকে ব্যবহার করে এই প্রতিযোগী সাম্প্রদায়িকতার দ্বিপাক্ষিক উপস্থাপনা ২০২১ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের —একেবারে কেন্দ্রবিন্দু। নন্দীগ্রাম কেন্দ্রে অবশ্য এদের বিরুদ্ধে কংগ্রেস বামফ্রন্টের শরিক দল ও সদ্য গঠিত ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টের যে সংযুক্ত মোর্চা তৈরী হয়েছে, তাদের তরফে প্রার্থী হয়েছেন মজদুর পরিবার থেকে উঠে আসা তরুণ লড়াকু ডি ওয়াই এফ নেত্রী মীনাক্ষী মুখার্জি। সংযুক্ত মোর্চার সাচ্চা ফ্যাসিবিরোধী জোটকে সাম্প্রদায়িক বলে দাগিয়ে দেবার সুযোগটা দিদি-গোদি সংবাদমাধ্যমের মুখ থেকে এক ঝটকায় কেড়ে নেওয়া হয়েছে। তৃণমূল, বিজেপি এবং হরেক কিসিমের বামবিরোধী ছদ্মপদ্ম ও তৃণভোজী সম্প্রদায়ের স্বঘোষিত বুদ্ধিজীবীরা ধরেই নিয়েছিলেন যে, এই কেন্দ্রে সংযুক্ত মোর্চার প্রার্থী হবে আব্বাস সিদ্দিকীর কোনো মুসলিম প্রার্থী। মীনাক্ষী, সেই খেলার ছকটা এক লহমায় বদলে দিয়েছেন। কিন্তু, তৃণমূল ও বিজেপি কারো পক্ষেই সম্ভব নয়—সাম্প্রদায়িকতার বিরোধিতা করা। নন্দীগ্রামে ও সারা রাজ্যে, সেই খেলাটাই তারা খেলে চলেছেন। শুভেন্দু মুখ্যমন্ত্রীকে বলছেন বেগম, আর মুখ্যমন্ত্রী কখনো ভুল উচ্চারণে, ভুলভাল মন্ত্রে দেবদেবীকে ডাকছেন তো কখনো হিজাব পড়ে আল্লাকে। নন্দীগ্রামকে ব্যবহার করে জমি আন্দোলনের সুবিধাভোগীদের এই সাম্প্রদায়িক কুনাট্য দেখছেন দুনিয়ার মানুষ। কার্ল মার্কস বলেছিলেন, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয় না। হলে তা তামাসা ও বিয়োগান্ত নাটকের রূপ নেয়। সেই তামাসাই আজ দেখছেন সাধারণ মানুষ।

এই ত্রিমুখী নির্বাচনের দিকে পশ্চিমবঙ্গ সহ সারা ভারতের মানুষ তাকিয়ে আছেন। আর, এই নির্বাচনে প্রধান ভূমিকা নিতে চলেছে, এই তিন রাজনৈতিক শক্তি নয়, প্রায় দেড় দশক আগে সংগঠিত নন্দীগ্রাম জমিআন্দোলন। সেই আন্দোলনের শক্তিকে ব্যবহার করে এই রাজ্যে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কপট ও চরম দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূল সরকারের স্বৈরাচারী নেত্রী নন্দীগ্রামের আন্দোলন বিষেয়ে কিছু প্ররোচনামূলক উক্তি, স্বগতোক্তি, সুকৌশলে ব্যবহার করেছেন। করেছেন, প্রতিপক্ষ, অর্থাৎ শুভেন্দু অধিকারীকে ছোট করতে। আঘাত দিতে। প্রবল হিংসায়, যেন, নিজের পায়েই নিজে কুড়ুল চালিয়েছেন। নন্দীগ্রামে আসলে কি ঘটেছিল এই নিয়ে সিপিআইএম এবং নন্দীগ্রাম আন্দোলনে শরিক নানা ধরনের শক্তির যে সব বয়ান প্রচলিত ছিল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই কু-উক্তি তাকেও নতুন করে উস্কে দিয়েছে। সে বিষয়ে কয়েকটা কথা বলা তাই জরুরি।

সিঙ্গুর এবং নন্দীগ্রামের অধিগ্রহণ বিরোধী আন্দোলন রাজ্যকে ছাপিয়ে সারা ভারতে তো বটেই ও এমনকি, বিশ্বের আরো অনেক দেশেও কর্পোরেট জমিঅধিগ্রহণ বিরোধী আন্দোলন রাজ্যকে ছাপিয়ে সারা ভারতে তো বটেই ও এমনকি বিশ্বের আরো অনেক দেশেও কর্পোরেট জমি-হাঙ্গরদের বিরুদ্ধে গণবিদ্রোহের সুস্পষ্ট বার্তা পাঠিয়েছিল। সেই বার্তাকে এ ভাবে নষ্ট করে দেওয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যাবতীয় নৈতিকতা বিবর্জিত ঘৃণ্য স্বার্থপর মনোবৃত্তির একান্ত পরিচায়ক। সে সময়, কি ঘটেছিল নন্দীগ্রামে তা কোনমতেই ভুলে যাবার নয়।

একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে একুশ শতকের শুরুতেই বামফ্রন্টের প্রধান শরিক সিপিআই (এম) কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদিত দেশিবিদেশী কর্পোরেট লগ্নি নির্ভর শিল্পবাণিজ্য উন্নয়নের মডেল গ্রহণ করে তা কাজে লাগিয়ে লগ্নি কুড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গে পুঁজিবাদী উন্নয়নের জন্য একেবারে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফলে, বামফ্রন্ট সরকার ও রাজ্য রাজনীতির অভিমুখ সম্পূর্ণ বদলে যায়। আর, তাদের গদি থেকে উৎখাত করতে এই সুযোগটাই খুঁজছিল পুঁজির দেশি ও বিদেশি মালিকরা। লগ্নি আনার পাকচক্রে জড়িয়ে, এক সময় ঘটনাপ্রবাহে বেসামাল বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য নন্দীগ্রামে পুলিশ পাঠালে ও তারা ঘটনাচক্রে মানুষের ওপর গুলি চালালে যা সার্থকতা পায়। এই কাজের শস্তি হিসেবে তারপর থেকে রাজ্যের মানুষ নির্দ্বিধায় এই রাজ্যে সে সময়ে প্রায় চিরস্থায়ী হয়ে ওঠা, ৩৪ বছরের আপাত টেকসই বামফ্রন্ট সরকারকে ধিক্কার জানায়। পঞ্চায়েত, নগরপালিকা, লোকসভা ও বিধানসভার নির্বাচনে, সংসদীয় রাজনীতির সবকটি ক্ষেত্র থেকেই একে একে তাদের উৎখাত করে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিসরেও এই রাজ্যে বামপন্থা আজও সেই হৃতগৌরব ও বিশ্বাস পুনরুদ্ধার করতে পারেনি। যে কারণে নানা বিকৃতি ও চরম দক্ষিণপন্থা এই রাজ্যে ক্রমশ বিস্তৃত হয়ে চলেছে।

কঠিন হলেও, সেই সত্যকে অস্বীকার করে কোনোই লাভ নেই। সিপিআই (এম), আজ যদি মমতার এই জাতীয় কৌশলী বক্রোক্তিকে খাঁটি বলে মনে করে—যাহা করিয়াছিলাম বেশ করিয়াছিলাম, অথবা আমরা কিছুই করি নাই, ভিন্ন গ্রহণের কতিপয় প্রাণী নন্দীগ্রামে অবতীর্ণ হইয়া এসব করিয়া ছিল; বা অধিকারী পরিবার সবকিছু করিয়াছিল, এমন ঘোষণা করতে থাকে—তাতে এই রাজ্যে বামপন্থীদের আরো প্রান্তিক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বৃদ্ধি পাবে। কায়েম করা যাবে ফ্যাসিবাদ। ঠিক সেটাই চায়—তৃণমূল কংগ্রেস ও ভারতীয় জনতা পার্টি।

নন্দীগ্রাম, হরিপুর, নয়াচরে জমি অধিগ্রহণ বিরোধী আন্দোলনে নানারকম স্বার্থ ও শক্তির সমাবেশ ঘটেছিল। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকর পেট্রোকেমিক্যাল হাব ও পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্প আনার পরিকল্পনা আমার মতো আরো অনেক পরিবেশ সচেতন ও পরিবেশ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত নাগরিক ও সংগঠনদের এই আন্দোলনে যুক্ত করেছিল। সাধারণ মানুষ বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞদের এই যুক্তিপূর্ণ কথা বিশ্বাস করেন। সিপিআই (এম) এবং মুখ্যমন্ত্রী এই বিতর্ক এড়িয়ে যান। নির্বাচনে জিতে ক্ষমতায় টিকে থাকা কমিউনিস্ট দলের সরকারকে সরিয়ে দেয়ার জন্য কমিউনিস্ট বিরোধী মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র, এবং তাদের হয়ে কাজ করা ফোর্ড, রকেফেলার ফাউন্ডেশনের অর্থ ও সহায়তা জোটে আন্দোলনের অনুকূলে। বিশ্বায়নের পরে এই এনজিওরা যে অনেকগুণ শক্তিশালী হয়ে ওঠে, তা বিনা কারণে নয়। ফোর্ড ও রকেফেলার, গেটস বিভিন্ন এনজিওগুলিকে অনুদান জোগায় প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক কারণেই। এরা প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের সাংবাদিকদেরও নিয়ন্ত্রণ করে।

বামফ্রন্ট সরকারের স্ববিরোধী পুঁজিবাদের তোষামোদকারী ভূমিকা উন্মোচিত করতে এরাই ময়দানে নামিদামি সর্বভারতীয় ''সমাজকর্মীদের'' নামিয়ে দেয়। এদের একমাত্র কাজই ছিল—বামফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা। এরা কেউ কেউ আবার বামপন্থীদের ভেক ধরে ময়দানে নামেন। যার ফলে, বামদলের কর্মী সমর্থকেরাও অনেকেই এদের সমর্থন করেন। তৃতীয়ত, প্রথমে গৌরাঙ্গ বেনামে নন্দীগ্রামে ভেঙ্কটেশ্বর রেড্ডি বা তেলেগু দীপক, ও পরে লালগড়ে কোটেশ্বর রাও বা কিষেনজি, মাওবাদীদের নিয়ে আন্দোলনে যুক্ত হয়। এরা কলকাতা, ও বাংলার গ্রামাঞ্চলে নিজেদের রাজনৈতিক প্রভাব বাড়াতে চাইছিল। এরা, গ্রামবাসীদের অস্ত্রশিক্ষা দেয়। অন্যদিকে তৃণমূল নেত্রী সংঘ-পরিবারের প্রশংসাধন্য বিজেপির শরিক হিসেবে বাম সরকার উচ্ছেদে তাদের সহায়তা চায়। তারা বিহার ও ঝাড়খণ্ড থেকে ভাড়াটে গুন্ডা পাঠায়। মুঙ্গের থেকে আনা হয় বন্দুক ও বুলেট তৈরির কারিগর। লক্ষণ শেঠ ও ইটভাটার মালিকরাও পাল্টা ভাড়াটে গুন্ডা আনায়। এদের দিয়ে চলতে থাকে এলাকা দখলের যুদ্ধ। গ্রামবাসীরা জমি দেবেন না বলে কৃতসংকল্প ছিলেন। এবং সেটাই ছিল এই আন্দোলনের মূল প্রাণশক্তি। কিন্তু, সহযোগী শক্তিদের ছিল নানা রূপ নানা স্বার্থ। এবং প্রচারের জন্য ঘটনার চাইতে নাটক ও গুজবের আশ্রয় নেওয়াটা দস্তুর হয়ে উঠেছিল। ফিল্ম ও চলচ্চিত্রের তারকা, গায়ক এরাও সেই থেকে বাংলার রাজনীতিতে অতিসক্রিয় হয়ে ওঠেন। ঘটনাস্থল থেকে দূরে থাকা মানুষরা প্রবল গুজবে ও বিবিধ অরাজনৈতিক পরিচিত ব্যক্তিত্বের সমাবেশে সযত্নে নির্মিত ভাবপ্রবণতার আবেশে গভীরভাবে প্রভাবিত হন। সব মিলিয়ে, একেবারে কোণঠাসা হয়ে যায় সিপিআই (এম) ও বাম সরকার।

শুভেন্দু অধিকারী ছিলেন নন্দীগ্রামের স্থানীয় ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির শীর্ষস্থানীয় নেতা। শুভেন্দু মাওবাদীদের নিয়ে জমি অধিগ্রহণ বিরোধী আন্দোলনকে একদিকে যেমন প্রতিবাদী আন্দোলন থেকে সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলনে রূপান্তরিত করেছিলেন, অন্যদিকে মাওবাদীরা আন্দোলনে যুক্ত হলেও তাদের হাতে আন্দোলনের কর্তৃত্ব সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দেননি। ১৪ মার্চের পুলিশী অভিযান সে সময়ের স্বরাষ্ট্র সচিব ও প্রশাসনের মাধ্যমে পূর্বঘোষিত থাকার ফলে মাওবাদী নেতৃত্বে ভূমিউচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি প্রস্তুত হয়েই ছিল। গ্রামের মন্দির ও মসজিদকেও কাজে লাগানো হয়। ফলে, গ্রামবাসীরা প্রায় সকলেই প্রতিরোধে যুক্ত হয়। পুলিশের সতর্কবার্তার ঘোষণা হরিণাম সংকীর্তনে কারো কানে আসে না। গুলিচালনার পরে, কর্পোরেট প্রচার মাধ্যমের সহায়তায় ক্ষয়ক্ষতি বহুগুণিত করে ও কল্পিত বিবরণ ছড়িয়ে পুলিশি অভিযানকে গণহত্যা বলে প্রচার করা হয়।

পুলিশের গুলিতে ৮ জন নিহত হলেও, ৬ জনের মৃত্যু হয় ছুরি ও বোমার আঘাতে। কিন্তু শত শত মৃত্যু, নির্মম নিষ্ঠুরতা ও গণধর্ষণের কথা অজস্র ডালপালা সহ প্রচারিত হয়েছিল। যার ফলে, সে সময়ে কলকাতার এক নাগরিক মহামিছিলে ধিক্কার ফেটে পরে। নন্দীগ্রামের ''গণহত্যা'' ইতিহাসে স্থান পায়। সিপিআই (এম)-এর সব চাইতে ভুল সিদ্ধান্ত ছিল নন্দীগ্রাম দলীয় ক্যাডার ও গুন্ডাদের দ্বারা পুনর্দখল করা। এই সময় শুভেন্দু মাওবাদীদের এলাকা ছাড়তে বাধ্য করেন। কিছু অত্যাধুনিক অস্ত্র বিপুল পরিমাণ অর্থ রেখে মাওবাদীরা নন্দীগ্রাম থেকে লালগড়ে সরে যায়। এই টাকা ও অস্ত্র ছিল নিশিকান্ত মন্ডলের হেফাজতে। যা মাওবাদীদের ফেরত না দেওয়ায়—নিশিকান্ত পরে মাওবাদীদের হাতে খুন হন। শুভেন্দুও তাদের হিটলিস্টে জায়গা করে নেয়। প্রধানত শুভেন্দু ও অধিকারী পরিবারের নেতৃত্বে জমিআন্দোলনে যুক্ত প্রায় ৫০ হাজার গ্রামবাসীকে দীর্ঘদিন গ্রামের বাইরে ত্রাণশিবিরে রাখা হয়। এই ত্রাণশিবিরে থাকা মানুষদের গণভিত্তির ওপর নির্ভর করেই তৃণমূল একের পর এক নির্বাচনে জয় নিশ্চিত করেছিল। এরাই এখনো শুভেন্দু অধিকারীর স্থানীয় গণভিত্তি।

অন্যদিকে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেখ সুফিয়ান ও আবু তাহেরের মতো নন্দীগ্রামের সংখ্যালঘুদের হাতে এনে, তাদের গুণ্ডাবাহিনীকে সারা রাজ্যে তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনী হিসেবে গত দশ বারো বছর ব্যবহার করে চলেছেন। শুভেন্দু অধিকারী ও অধিকারী পরিবার নানা পদ লাভ করে। কিন্তু, শহিদ পরিবার ও দীর্ঘদিন ত্রাণশিবিরে থাকা মানুষেরা, পরিবর্তনের কোনো সুযোগ সুবিধে তেমন পাননি। জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে আগ্রহী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী শুভেন্দু ক্রমশ ভারতীয় জনতা পার্টির দিকে ঝুঁকতে থাকেন। সেটা জেনেও, তৃণমূল নেত্রী কেন এত দিন নিশ্চুপ ছিলেন সেটাই এক বিরাট প্রশ্ন।

নন্দীগ্রামে গণহত্যা ঘটেনি, ঘটেছিল পুলিশী গুলিচালনা। প্রশাসন ও সিপি (এম)-এর তরফে শৃঙ্খলা ফেরত আনার নাম করে সন্ত্রাস তৈরির ও জমি আন্দোলনকে দমন করার প্রয়াস। সিপিআই (এম)-এর মুখ্যমন্ত্রী ব্যক্তিগত জীবনে সৎ হলেও, কতদূর গণবিচ্ছিন্ন নয়া উদারনৈতিক অর্থনীতির মোহে কতদূর নিমজ্জিত, কত দূর প্রশাসন ও দলীয় দুর্বৃত্ত নির্ভর—তা সে সময়ে প্রমাণ হয়ে যায়। পরিবর্তনের পরের শাসন, যদিও এতই দ্রুত নিম্নগামী হয়েছে, যে অনেকেই সিপিআই (এম)-এর সেই ভুলকে ভুল বলেই আজ মানতে চান না। যদিও, জনসাধারণের স্মৃতি তত দুর্বল নয়। মনে রাখতে হবে, অর্থনীতির লড়াই জরুরি, কিন্তু সেটাই সব নয়। বামপন্থার আদর্শনৈতিক ও মানুষকে মর্যাদা দেবার দিকটাই তার শক্তির মূল উৎস। নন্দীগ্রাম সেই শিক্ষাই দিয়ে গেছে। মমতা ও শুভেন্দুর অসংলগ্ন কথার প্যাচে সিপিআই (এম) দল ও তার বন্ধুরা আজ যদি নিজের অতীত ভুলে যায়—তবে তা স্মরণ করিয়ে দেওয়াই হবে আমাদের মতো বন্ধুদের কাজ।

কেন্দ্রের বিজেপি সরকার সর্বনাশা

১-এর পাতার পর

আসেনি। সমস্ত দিক থেকে এই সরকার দেশের মানুষের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করেছে। বিগত প্রায় সাত বছরে দেশের শ্রমজীবী মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি একে একে অপসারিত হয়েছে। আরও সুস্পষ্ট করে বললে ২০১৯-এর সাধারণ নির্বাচনে বিজেপি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা (৩০৩ আসন) লাভ করার পর থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যেন ধরাকে সরা জ্ঞান করতে শুরু করেছেন। দেশের জনগণকে বিভাজিত করে চরম নিপীড়ণের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে। শ্রমিক শ্রেণির ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার থেকে শুরু করে বেতন নির্ধারণ বা চাকুরির নিরাপত্তার সম্ভাবনা এবং উৎপাদনী কর্মকাণ্ডে সসম্মান অংশগ্রহণের সুযোগ ইত্যাদি সবই অপসৃত। দীর্ঘ বহু বছর যাবৎ প্রচলিত শ্রম আইনগুলিকে মাত্র চারটি কোডের মধ্যে এনে শ্রমিক শ্রেণিকে পুঁজিপতিদের প্রতিবাদহীন শ্রমদাসে পরিণত করেছে। ক্রীতদাস প্রথা নতুন মোড়কে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যতটুকু পারস্পরিক আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের রীতি এদেশে চালু ছিল তা সবই বিলকুল বরবাদ হয়ে গেছে। দীর্ঘস্থায়ী লড়াই সংগ্রামের পথে শ্রমিক শ্রেণির অর্জনগুলি বেমালুম লোপাট করে দেওয়া হয়েছে। এমনকি, নারী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে যে মাতৃত্বকালীন সবেতন ছুটির ব্যবস্থা ছিল তা-ও অস্বীকৃত হবার সমূহ সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। যাঁরা দেশের জন্য সম্পদ সৃষ্টি করেন, যাঁদের স্বেদনিঃসরণের মাধ্যমে উৎপাদন প্রক্রিয়া চলমান তাঁদের প্রতি ন্যূনতম সম্মান দূরস্থান, স্বীকৃতিটুকু পর্যন্ত অস্বীকৃত হচ্ছে।

মোদী সরকার সংসদের একচেটিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শ্রমকারী মানুষদের জন্য যেসব অধিকার ও সুযোগ নির্দিষ্ট করা আছে সেগুলিও অনেকাংশে অস্বীকার করছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা বা আই এল ও'র অস্তিত্ব পর্যন্ত বিপর্যস্ত। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বিশেষত বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে এখন আট ঘণ্টা শ্রমকালের রীতিও পাল্টে ফেলা হচ্ছে। মালিকদের প্রভূত সুবিধা করে কাজের সময় দশ থেকে বারো ঘণ্টা করে দেওয়া হয়েছে। অশেষ যন্ত্রণায় বহু শ্রমিক তাঁদের কর্মক্ষেত্র থেকে বাধ্য হয়ে সরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। অর্থাৎ, ঘুর পথে ছাঁটাই হয়ে যাচ্ছেন বহু সংখ্যক শ্রমিক।

আর মোদী সরকারের অনেকগুলি মন্ত্রক তো সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছে পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বছর বয়স অথবা ত্রিশ বছরের মতো চাকুরির মেয়াদ কাল হয়ে গেলেই স্বেচ্ছা নিবৃত্তির বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা চালু হচ্ছে। ভারতীয় রেলের বিভিন্ন দপ্তরে এমন গর্হিত অপরাধমূলক কর্মসূচি চালু হয়ে গেছে। সরকার পরিচালিত বিশ্বের বৃহত্তম শিল্প হিসেবে ভারতীয় রেল শুধুমাত্র একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান নয়। এই বিশালাকার সংস্থাটির সামাজিক দায়িত্বও অপরিসীম। দেশের প্রান্তিক মানুষদের মধ্যেও একে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের মুখ্য মাধ্যম দেশের রেল পরিষেবা। প্রতিদিন কয়েক কোটি মানুষ এই পরিষেবাটির ব্যবহারে বহুবিধ প্রয়োজন মেটান। এখনও রেলের যাত্রীমাশুল ধরা ছোঁয়ার বাইরে নয়। যাত্রীপরিবহণের সঙ্গেই দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পণ্য পরিবহণেও রেলের ভূমিকা অপরিহার্য। ভারতীয় রেল এই বিপুলাকার দেশের গর্ব বলেই উল্লিখিত হয়ে আসছে দীর্ঘকাল। মোদী সরকার সেই ক্ষেত্রটিকে বিশ্বপুঁজিবাদ বা নয়া উদারবাদের শর্তপালনে দ্রুত বেসরকারিকরণের উদ্যোগ নিয়ে এগিয়েছে। ইতোমধ্যেই অনেকগুলি রেল স্টেশন বেসরকারি মালিকানায় দিয়ে দেওয়া হয়েছে। অনেকগুলি রেল যোগাযোগ ব্যবস্থাও আদানি বা অন্য কোনো ব্যবসায়ীর হাতে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত হয়ে যাচ্ছে। রেলে কর্মী ছাঁটাই করার এমন উদগ্র আয়োজন ওইসব বেসরকারি পুঁজি মালিকদের সুবিধার্থেই করা হচ্ছে। দেশের মানুষের জীবন বিপর্যস্ত করে বেসরকারি পুঁজির অফুরন্ত সুবিধা করে দেওয়া কোনো সভ্য সরকারের কাজ হতে পারে না। যে দলটি এসব করে চলেছে তাদের সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও বিশিষ্ট বামপন্থী নেতা যথার্থই উল্লেখ করেছিলেন 'বর্বরের দল'।

শুধু কি ভারতীয় রেলেরই বেসরকারিকরণ হচ্ছে? আপাতত ৩২টি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প উদ্যোগ বিক্রির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে। জল স্থল আকাশ কোনকিছুই বাদ রাখছে না মোদী এবং তাঁর সাঙ্গাৎরা। লক্ষণীয় যে, ভারতের আর্থিক ব্যবস্থা যা মূলত সরকারি নিয়ন্ত্রণে থাকার ফলে সাধারণ মানুষের যেমন বিশেষ সুবিধা ছিল ঠিক তেমনভাবেই দেশের সরকারি প্রশাসনও প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলির অধিবাসীদের জন্য বেশ কিছুটা উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের অর্থ জোগাতে পারতো। শুধু প্রত্যন্ত অঞ্চলই বা হবে কেন, দেশের নানা প্রান্তে যেসব সরকারি চিকিৎসালয়গুলি গড়ে উঠেছে, যেসব বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, বিদ্যালয় প্রভৃতি গড়ে উঠেছে তার মূল অর্থের ব্যবস্থা করেছে ভারতের ব্যাংকিং বা বীমা সংস্থাগুলি। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা রহিত হয়ে ভারতের আর্থিক ক্ষেত্রগুলির বেসরকারিকরণ একান্তভাবেই আত্মঘাতী। এর ফলে এক অভাবিতপূর্ব সংকটে দেশ পড়তে চলেছে। মোদী সরকার কোনো জনকল্যাণমূলক কাজ করতে আদৌ আগ্রহী নয়। কিন্তু এমন কোনো মাথার দিব্যি কেউ দেয়নি যে এই সরকারের কোনো পরিবর্তন হবে না। আজ না হয় কাল মোদী সরকার সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের চাপে ক্ষমতা থেকে সরে যেতে বাধ্য হবে। ইতিহাসের আস্তাকুড়ে স্থান হবে মোদীর। কিন্তু ব্যাংক এবং বীমা সংস্থাগুলির বেসরকারিকরণ হবার পরে আর কোনো তাৎপর্যপূর্ণ জনকল্যাণকামী কর্মসূচি অন্য কোনো সরকার গ্রহণ করতেই দ্বিধান্বিত হয়ে পড়বে। এক স্থায়ী ও অপূরণীয় ক্ষতি করে ফেলছে বর্তমান বেপরোয়া মোদী সরকার। দেশ রসাতলে যাবে। এমন ভয়ংকর এক দেশদ্রোহীকে যত দ্রুত কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা থেকে টেনে নামিয়ে দেওয়া যায় ততই দেশপ্রেমের প্রকৃষ্ট কাজ হবে। এছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই।

ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ প্রায় ৬২ শতাংশ এখনও কৃষির ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। তাঁদের জীবন সম্পূর্ণভাবে কৃষিকাজ নির্ভর। এই অতি তাৎপর্যপূর্ণ উৎপাদনী ক্ষেত্রেও মোদী সরকার নৃশংসভাবে আক্রমণ করা হয়েছে। গত জুন মাসে করোনা সংক্রমণের সন্ত্রস্ত সময়ের অনৈতিক সুযোগ নিয়ে মোদী সরকার তিনটি কৃষি আইন অর্ডিনান্স হিসেবে গ্রহণ করে। এর সঙ্গেই বিদ্যুৎ আইনের সংশোধনীও গৃহীত হয়। পরবর্তীকালে সংসদে বিশেষ আলোচনার সুযোগ না দিয়েই ওই অর্ডিনান্সগুলিকে আইনে পরিণত করা হয়। শ্রম কোডগুলি ১ এপ্রিল ২০২১ থেকেই যেমন লাগু হয়েছে সেভাবেই তিনটি কৃষি আইনও বাস্তবায়িত করার ব্যবস্থা চলছে। এই সার্বিক সর্বনাশ সম্ভব করতে মোদী সরকার বদ্ধপরিকর। বিগত প্রায় চারমাসেরও বেশি সময় ধরে দেশের লক্ষ লক্ষ কৃষক প্রতিবাদ প্রতিরোধে উত্তাল। সরকারের কোনো মানবিক বোধও নেই।

সকলেই জানেন যে, উল্লিখিত তিনটি কৃষি আইন শুধুমাত্র সাধারণ কৃষিজীবী মানুষেরই সামূহিক ক্ষতিসাধন করবে না। দেশের অগণিত দরিদ্র মানুষের খাদ্য সংস্থানেও অতি বিরূপ প্রভাব ফেলবে। বিশেষ করে, অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন ১৯৫৫ প্রত্যাহৃত হবার পর কতিপয় অতি ধনিক ব্যক্তির হাতে অঢেল খাদ্য শস্য মজুত করার অবাধ সুযোগ পাবে। বাজারে খাদ্য শস্যের কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে অস্বাভাবিক মুনাফা করে আরো বড়লোক হবে। এভাবে চলতে থাকলে একসময় সরকারি খাদ নিগম সাধারণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষুধার অন্ন বিতরণের যে সামান্য সুযোগ আছে, তাও থাকবে না। দেশের দুর্ভিক্ষ হবার আশঙ্কা নতুন করে দেখা দেবে। খাদ্যসামগ্রী প্রচুর পরিমাণে থাকলেও মানুষের কাছে তা পৌঁছাবে না। মোদী সরকারের অকৃপণ বদান্যতায় আদানি আম্বানির মতো তাঁবেদার পুঁজি মালিকদের রমরমা আরো বেড়েই চলবে। মানুষের অধিকার পর্যুদস্ত হবে এবং মাত্র এক শতাংশ আরো ফুলে ফেঁপে উঠবে। এমন অবস্থা চলতে দেবার অর্থ মানবিক সংকট সৃষ্টিকে সহায়তা করা।

আসন্ন রাজ্য বিধানসভাগুলির নির্বাচনে সাধারণ মানুষকে মনে করিয়ে দিতে হবে যে মোদী সরকার অবশ্যই এই নির্বাচনে পরিবর্তিত হবে না কিন্তু বিজেপির চরম পরাজয় মোদীকে একটি নিশ্চিত বার্তা দেবে যে দেশের সাধারণ মানুষ আর তাদের এমন বেয়াদপি সহ্য করতে প্রস্তুত নয়। জিনিসপত্রের দাম বিশেষত, পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন তেল, রান্নার গ্যাস, সরিষার তেল ভোজ্য তেলের দাম মানুষের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। সমস্ত ধরনের ডাল, গম, দুধ, ডিম, মাংস প্রভৃতির দামও এক অবিশ্বাস্য স্তরে উঠে গেছে। এর কোনো সদর্থক পরিবর্তনে মোদী সরকার উদ্যোগী নয়। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারও যতটুকু ভূমিকা পালন করতে পারে তা করতে আদৌ উৎসাহী নয়। এক অর্থে দুটি সরকারই সমানভাবে সাধারণ জনজীবনকে বিপর্যস্ত করতে উন্মুখ। সুতরাং তৃণমূলের বিকল্প যেমন বিজেপি হতে পারে না তেমনি, বিজেপিকে ঠেকাতে তৃণমূল কংগ্রেসও কোনভাবেই সমর্থ হবে না। কারণ, উভয় দলেরই দৃষ্টিভঙ্গি এবং কর্মসূচি এক।

সাধারণ মানুষকে উপলব্ধি করতে হবে, রাজ্যের নৈরাজ্যজনক সামাজিক পরিবেশ পরিবর্তিত করতে হলে বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেসকে পর্যুদস্ত করে বামপন্থীদের নেতৃত্বে সংগঠিত সংযুক্ত মোর্চার সরকার গড়ে তোলাই একমাত্র বিকল্প। ধর্ম বা জাতের নামে নয়, কাজের সুযোগ এবং ভাতের সঠিক সংস্থান করতেই বিকল্প নীতির সরকার গড়ে তুলতে হবে। রাজ্যবাসী নিশ্চিতই এই কঠোর বাস্তব অবস্থা বুঝে সংযুক্ত মোর্চার পক্ষে শক্তিশালী অবস্থান নেবে, এমন প্রত্যয় আমাদের অবশ্যই আছে।

নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে রাজের বামপন্থী মহিলা সংগঠনগুলির দাবিপত্র পেশ

গত ২৫ মার্চ, ২০২১ রাজ্যে বামপন্থী মহিলা সংগঠনসমূহের পক্ষ থেকে যৌথভাবে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে একটি স্মারকলিপি পেশের মাধ্যমে নির্বাচন প্রাক্কালে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মাননীয় মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের জ্ঞাতার্থে উত্থাপিত করা হয়। বামপন্থী মহিলা প্রতিনিধিবৃন্দ মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে জানান যে, অতীতের মতো এবারও লক্ষ করা যাচ্ছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রশ্রয়ে কিছু দুষ্কৃতি ভোটারদের ক্রমাগত হুমকি দিচ্ছে। এমনকি পথেঘাটেও মহিলাদের শাসাচ্ছে এবং অত্যাচার করছে দুষ্কৃতীরা। শুধু তাই নয় নির্বাচনের প্রাক্কালে সংযুক্ত মোর্চার প্রার্থীদের পক্ষে ভোট দিলে বিপদের হুমকি দিচ্ছে। এই ভয়াবহ আবহের মধ্যে সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য নির্ভয়ে ভোট দেওয়া, তৃণমূল-বিজেপি'র সংঘর্ষের সংবাদে আতঙ্ক সৃষ্টি হলে তার নিরসনে ব্যবস্থা নেওয়া, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী সহ প্রতিটি মহিলাকে ভোটদানের সময় নিরাপত্তা দেওয়া, ভোট কর্মীদের নিরাপত্তা রক্ষা করা এবং প্রতি দফায় শান্তিরক্ষার দাবি রাখেন বামপন্থী মহিলা সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

প্রতিনিধি দলে দাবিপত্রে স্বাক্ষরকারী ছিলেন কনীনিকা ঘোষ বোস, অঞ্জু কর, সর্বানী ভট্টাচার্য ও তপতী ভাদুড়ী, শ্যামশ্রী দাস ও পারমিতা দাশগুপ্ত এবং অপর্ণা বিশ্বাস প্রমুখ ও রাজ্যের বামপন্থী মহিলা সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

বিধানসভা নির্বাচনে আর এস পি প্রার্থী

২৭ মার্চ, ২০২১

১) **ছাতনা** — কম. ফাল্গুনী মুখার্জী

১ এপ্রিল, ২০২১

২) **গোসাবা (এস সি)** — কম. অনিল চন্দ্র মন্ডল

৬ এপ্রিল, ২০২১

৩) **বাসন্তী (এস সি)** — কম. সুভাষ নস্কর

১০ এপ্রিল, ২০২১

৪) **কুমারগ্রাম (এস টি)** — কম. কিশোর মিনজ্

৫) **মাদারিহাট (এস টি)** — কম. সুভাষ লোহার

১৭ এপ্রিল, ২০২১

৬) **ময়নাগুড়ি (এস সি)** — কম. নরেশচন্দ্র রায়

২৬ এপ্রিল, ২০২১

৭) **জঙ্গীপুর** — কম. প্রদীপ কুমার নন্দী

৮) **কুশমন্ডি (এস সি)** — কম. নর্মদাচন্দ্র রায়

৯) **তপন (এস টি)** — কম. রঘু ওরাওঁ

১০) **বালুরঘাট** — কম. সুচেতা বিশ্বাস

২৯ এপ্রিল, ২০২১

১১) **বোলপুর** — কম. তপন হোড়

লকডাউন, আমফান ও বামপন্থী গণসংগঠনগুলির ভূমিকা

সৌম্য শাহীন

২০২০ সালের ২৪ মার্চ, সন্ধে ৮টা। প্রধান সেবকের মুখ ভেসে উঠলো টেলিভিশনের পর্দায়। জানালেন আর মাত্র চার ঘণ্টা, তারপরেই শুরু হবে দেশব্যাপী লকডাউন। আপামর ভারতবাসী সেদিন দেশভক্তিতে গদগদ হয়ে প্রদীপ জ্বেলেছিল, থালা কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়েছিল। আমরা শুনেছিলাম। রাষ্ট্র শুনিয়েছিলো। কিন্তু তারপর কোনোরকম সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা ছাড়াই লকডাউন শুরু হবার পর থেকে গরিবের ঘরে ক্রমাগত বেজে চলেছিল যে খালি থালাগুলি, তার আওয়াজ বোধহয় রাষ্ট্রের কানে পৌঁছায়নি। পৌঁছায়নি হয়তো অধিকাংশ ভদ্রবিত্ত ভারতবাসীর কানেও। তবু যারা বিশ্বাস করে মানুষ হয়ে দাঁড়ানো যায় মানুষের পাশে, সেই বামপন্থী গণসংগঠনগুলি ঝাঁপিয়ে পড়ে এই দুর্দশার দিনে। শুধু খাদ্যের নয়, অধিকারের লড়াইটা জিতে নেবার মতো সাহস বুকে নিয়ে প্রান্তিক মানুষের পাশে এসে দাঁড়ায় তারা। এই বিশ্বাস নিয়ে, যে যৌথতা আমাদের জীবনের মর্মার্থ উপলব্ধি করতে শেখায়, সেই যৌথতার প্রয়োজন এই দুঃসময়ে। বিপুল উৎসাহে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে শুরু হলো জনগণের রান্নাঘর-গ্রামের মানুষ জোগান দিলেন ক্ষেতের সব্জি, রান্নার কাঠ, জোগালেন সম্মিলিত শ্রম। এই উদ্যোগের কথা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে জানতে পেরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ সাহায্য পাঠালেন। গ্রাম আর শহরের এই মেলবন্ধন বাংলার মানুষকে নতুন স্বপ্ন দেখতে শেখালো।

এইসময় সংবাদপত্রের পাতায়, টেলিভিশনের পর্দায় অভিবাসী শ্রমিকদের দুর্দশার ছবি সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের রাতের ঘুম কেড়ে নেয়। বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে গণসংগঠনগুলি ঝাঁপিয়ে পড়লো তাদের পাশে দাঁড়াতে। সোশ্যাল মিডিয়ায় গড়ে উঠলো অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য নেটওয়ার্ক, তৈরি হলো হেল্পলাইন, তাঁদের ত্রাণ পাঠানো সরকারি ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা, শ্রমিক স্পেশাল ট্রেনের টিকিট বুক করা—এরকম অজস্র কাজ।

অবশেষে কাজ হারিয়ে, তিনমাস ধরে অসহ্য কষ্ট সহ্য করে তিরিশ লক্ষ অভিবাসী শ্রমিক রাজ্যে ফিরে এলেন। ফলে পুরো চাপটাই এসে পড়ে গ্রামীণ অর্থনীতির ওপর। শ্রমজীবী মানুষের দুর্দশা বহুগুণ বাড়িয়ে দিলো আমফান ঝড়ে। কারও বাড়ি ভাঙলো, কারও মাথার ওপর থেকে ছাদ উড়ে গেলো। ক্ষেতের ফসল, পুকুরের মাছ, আসবাবপত্র, বই-খাতা নষ্ট হলো। মাথার ওপর আস্তরণ দেবে নাকি খাবার জোগাড় করবে, সেই ভেবে হিমশিম খাচ্ছে যখন মানুষ, তখন শুরু হলো, রাজ্যের শাসকদলের নির্লজ্জ দুর্নীতি। একদিকে ত্রাণের চাল-ত্রিপল চুরি, অন্যদিকে সমস্ত সরকারি ক্ষতিপূরণ ঢুকছে শুধুমাত্র শাসকদলের ঘনিষ্ঠদের একাউন্টে। বাংলার গ্রামের পর গ্রাম—এই এক চিত্র। কিন্তু এই চিত্রের মধ্যে আর একটা চিত্রও ছিল। গ্রামের পর গ্রাম এই বেহাল দশায় মানুষের পাশে সমস্ত শক্তি সামর্থ্য আর আশ্বাস নিয়ে কিন্তু মানুষই দাঁড়িয়েছিল সেদিন। যাদের একটু সামর্থ্য আছে, তারাই ঝড়ের পরে আশে পাশের মানুষের খোঁজে বেরিয়েছেন, পাশে দাঁড়িয়েছেন। কেউ চাঁদা তুলে কমিউনিটি কিচেন চালিয়েছেন, তো কেউ ত্রিপল, শুকনো খাবার, ওষুধ, পানীয় জল নিয়ে পৌঁছে গেছেন প্রত্যন্ত অঞ্চলে। সম্মিলিত সামাজিক প্রচেষ্টায় সর্বস্ব হারানো মানুষগুলোও ঘুরে দাঁড়ানোর রসদ পেয়েছেন। ঘর বেঁধেছেন নতুন করে। এক অনন্য জীবনীশক্তি নিয়ে বাঁচার লড়াইয়ে তারা জিতেছেন।

গ্রামীণ ভারতবর্ষে পড়ুয়াদের সিংহভাগ প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী। স্কুলের পড়া বোঝার জন্য হতদরিদ্র মা বাবাকেও নিজেদের সামান্য রোজগার থেকে একটা অংশ ব্যয় করতে হয় সন্তানের টিউশন খাতে। খরচ বইতে না পারলে মাঝপথেই বহু মেধাবী ছাত্র স্কুলছুট হতে বাধ্য হয়। শিশুশ্রম, বাল্যবিবাহের মতো সামাজিক ব্যাধিগুলো তাই আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখে খেটে খাওয়া মানুষের জীবনকে।

কোভিড মহামারীর জন্য যখন দেশব্যাপী লকডাউন শুরু হলো, তখন অধিকাংশ শ্রমজীবী মানুষ কাজ হারিয়ে ঘরে বসে যেতে বাধ্য হন। এইসময় আমরা দেখলাম এক নতুন বৈষম্য-যার পোশাকি নাম দেওয়া হলো ''ডিজিটাল ডিভাইড''। একদিকে অনলাইন ক্লাসের সৌজন্যে উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণিভুক্ত শিশুদের পড়াশোনা চালানোর সুযোগ অব্যাহত রইলো, আর সরকারি ইস্কুলে পড়া নিম্নবিত্ত শিশুদের জন্য পড়ে রইলো অবহেলার অন্ধকার। মহামারীর কারণে আর্থিক ভাবে দুঃস্থ পরিবারের শিশুদের সঙ্গে স্বচ্ছল ঘরের ছেলেমেয়েদের একটা অনতিক্রম্য ব্যবধান তৈরি হয়। এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়তে বিভিন্ন অঞ্চলে সামাজিক সংগঠনগুলির উদ্যোগে গড়ে উঠলো মুক্ত আকাশের নীচের পাঠশালা, লাইব্রেরী। দীর্ঘদিন স্কুলগুলো বন্ধ থাকায় পড়ুয়াদের লেখাপড়া করার অভ্যাস যাতে ছুটে না যায়, তার জন্য কলকাতা ও নিকটবর্তী শহর থেকে কলেজ- বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া তরুণ-তরুণীরা গড়ে তুললো এক সমান্তরাল শিক্ষাব্যবস্থা। শ্রমজীবী ক্যান্টিন-শ্রমজীবী বাজারগুলি এক বিকল্প অর্থনৈতিক মডেলের সন্ধান দিলো, যার ভিত্তি সামাজিক যৌথতা।

একই সঙ্গে একশো দিনের কাজ, আমফানের ক্ষতিপূরণ রাজ্যের শাসকদলের দুর্নীতি, লকডাউনের মধ্যে বিদ্যুতের অস্বাভাবিক বিল বাতিল ও ক্ষুদ্র ঋণমুক্তির দাবি, রেশন ব্যবস্থার উন্নতি-এরকম বেশ কিছু নাগরিক দাবিদাওয়া নিয়ে চলল ডেপুটেশন -বিক্ষোভ কর্মসূচি। বেশ কিছু ক্ষেত্রে নিজেদের দাবিদাওয়া আদায় করতে সক্ষম হলেন মানুষ। কোথাও আবার শাসকদল-প্রশাসন দুষ্টচক্রের বিরুদ্ধে গড়ে উঠলো গণপ্রতিরোধ। সব মিলিয়ে, পঞ্চাশের মন্বন্তরের কঠিন দিনগুলিতে বামপন্থী যুবক যুবতীরা যে উজ্জ্বল ভূমিকা নিয়েছিলেন, তারই সার্থক উত্তরাধিকার যেন আবার দেখা যাচ্ছে বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে। শত ধারায় বিভক্ত বাম ছাত্র-যুবদের মধ্যে মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াইকে কেন্দ্র করে এক বৃহত্তর ঐক্য গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখছিলেন অনেকেই। এই ঐক্য আরো জোরদার হয়ে ওঠার সম্ভাবনাকে উসকে দিয়ে দিল্লীর সীমান্তে শুরু হলো কৃষক বিদ্রোহ।

আজ বামপন্থী কর্মীরা ও বিভিন্ন গণসংগঠনগুলি ২০২১ সালের রাজ্য নির্বাচনে ভোট দেবেন কি না, দিলে কাকে দেবেন, এই প্রসঙ্গ তুলে বিতর্ক করছেন। বিগত পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস মাথায় রেখেই এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে হবে। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের বিপুল সাফল্যের পর বিজেপি ক্রমশ নিজেকে এ রাজ্যে প্রধান বিরোধী দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু তার আগে বহু দশক ধরে যেভাবে আর এস এস রাজ্যে তার শিকড় ছড়িয়েছে, সেই ইতিহাসকে এড়িয়ে যাওয়া শুধু অন্যায় নয়, অপরাধ হবে। আরএসএস নাগরিক সমাজে শান্তিপূর্ণ অনুপ্রবেশের জন্য ব্যবহার করেছে স্কুল, জাত/সম্প্রদায়ভিত্তিক সামাজিক পরিষেবার ব্যবস্থা, এবং এইভাবে ছড়িয়ে দিয়েছে তাদের বিষাক্ত মতাদর্শ। কিন্তু এই প্রক্রিয়া প্রায় কোনো রাজনৈতিক বাধার মুখে পড়েনি। তার কারণ, সংসদীয় বামেরা সেসময়ে ভোটের পাটিগণিত নিয়ে বুঁদ হয়ে থাকার ফলে সামাজিক ক্ষেত্রে ক্রমশ তাদের দখল হ্রাস পেয়েছে। এখন শিরে সংক্রান্তি, এই অবস্থায় বামপন্থী ও উদারপন্থী সংগঠন আহ্বান করছেন বিজেপি'র বিরুদ্ধে সর্বাত্মক জোট হোক। বিশেষত বিহার নির্বাচনে ''মহাগঠবন্ধনে''র তুলনামূলক সাফল্যের পর এই দাবি আরও জোরালোভাবে উঠে এসেছে। বিজেপিকে হারানোর লক্ষ্যে কিছু বামপন্থী উদ্যোগ নিয়েছেন মুখে না বললেও আকারে ইঙ্গিতে স্পষ্ট যে বিজেপিকে হারাতে প্রয়োজনে তৃণমূলকে ভোট দিতে হবে। সম্প্রতি একদল স্বঘোষিত বামপন্থী শিল্পী-সাহিত্যিক অধিকতর অপশক্তি এবং লঘু অপশক্তির বিভেদরেখা টেনে সরাসরি তৃণমূলের পক্ষে ভোট দেওয়ার কথা বলছেন।

রাজনৈতিক ভাবে রাজ্যের মূলধারার বামপন্থীদের মতে-বিজেপি দেশের সামনে প্রধান ও অনেক বড় বিপদ হলেও পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে শাসক তৃণমূলও বিজেপি'র মতোই বিপজ্জনক এবং তৃণমূলকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করা অত্যন্ত জরুরী। কেননা তৃণমূলের অপশাসনের কারণেই বিজেপি'র শক্তিবৃদ্ধি হচ্ছে এবং জনমানসে বিকল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। অতএব, তাদের মতে, বিজেপি'কে পরাস্ত করতে, অবশ্যই তৃণমূলকে পরাস্ত করতে হবে। একথা ঠিক যে সমস্ত দক্ষিণপন্থী দলের নীতি, কার্যপদ্ধতির মধ্যেই নানা ধরনের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু কোনও পরিস্থিতিতে বা অজুহাতেই বিজেপির সঙ্গে দেশের অন্য কোনও দলকে সমান বিপজ্জনক বলে মনে করা যায় না, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও না। তবে, এই মতামত থেকে 'প্রধান শত্রু', 'অপ্রধান শত্রু' চিহ্নিত করে এবং প্রধান শত্রুর বিরুদ্ধে 'কম খারাপ' অপ্রধান শত্রুর সঙ্গে বোঝাপড়ার তত্ত্ব হাজির করে তৃণমূলের সঙ্গে জোট গঠন করা বা তৃণমূলের বিরোধিতায় ঢিলে দেওয়াকে আমরা ক্ষতিকর অফলপ্রসূ প্রস্তাবনা হিসেবেই বিবেচনা করি। বিজেপিকে রুখে দিতে তৃণমূল বা সমমনোভাবাপন্ন শক্তির সাথে জোট বাস্তবে বিপর্যয়ই ডেকে আনবে। কিন্তু কৌশলগত পন্থা কী হবে, সেখানে শ্রেণি সংগ্রামের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা নীতি আর বাস্তব পরিস্থিতির বাস্তব বিশ্লেষণের সমন্বয় দরকার।

বামপন্থীরা যদি এই ক্রান্তিকালে তাদের বিকল্প রাজনৈতিক মডেল দিতে পারেন, দেশব্যাপী চলমান কৃষি আন্দোলনের সঙ্গে বাংলার শোষিত নিপীড়িত ক্ষুদ্র ও জমিহীন কৃষককে শ্রেণির ভিত্তিতে সংগঠিত করতে পারেন, তবেই এত কথা গঠনমূলক পরিণতি পাবে। প্রান্তিক মানুষের মধ্যে আব্বাসের জনপ্রিয়তাকে ব্যবহার করে হতদরিদ্র ক্ষেতমজুর, ভাগচাষীর কাছে পৌঁছতে হবে, তাদের মধ্যে শ্রেণিরাজনীতির বীজ বপন করতে হবে। তার জন্য সবার আগে প্রয়োজন কর্পোরেট পুঁজিনির্ভর বৃহৎ শিল্পভিত্তিক উন্নয়নের যে তত্ত্বকে তাঁরা আঁকড়ে ধরেছিলেন সপ্তম বামফ্রন্ট সরকারের আমলে, তাকে শুধরে নিয়ে বিকল্প উন্নয়নের মডেল অন্বেষণ করা।

ভারতবর্ষে এই মুহূর্তে কেন্দ্রীয় ভাবে ফ্যাসিস্ট শাসন চলছে। এই অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যে গণতান্ত্রিক পরিসর যেটুকু বেঁচেবর্তে আছে, তাকে রক্ষা করার জন্য। সেক্ষেত্রে সরাসরি ভোটে না জড়ালেও পক্ষ বাছতে হয়। বামপন্থী প্রার্থীদের পক্ষে প্রচার করা গণআন্দোলন কর্মী হিসেবে আমাদের কাছে ''চয়েস'' নয়, ''কম্পালশন''। একথা মনে রাখা প্রয়োজন, যে লকডাউন আর আমফান ঝড়ের সময় তৃণমূল কংগ্রেস সরকারে থেকেও উদাসীনতা আর নির্লজ্জ চুরির মাধ্যমে নিজেদের উলঙ্গ করে দিয়েছিল, সেই একইসময় বামপন্থী কর্মীরা ক্ষমতার অলিন্দের বাইরে থেকেও ছশোর বেশি ক্যান্টিন চালিয়েছে, পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য হেল্পলাইন খুলে তাদের রেশনের ব্যবস্থা করা থেকে ঘরে ফেরানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, রিলিফ ঘাড়ে পৌঁছে গেছে রাজ্যের সুদূরতম প্রান্তে। ফলে কিছুটা হলেও মানুষের আস্থা ফিরে পেয়েছে বামপন্থীরা। তৃণমূল বিরোধী ভোট ২০১৯এ যেভাবে রামের বাক্সে ঢুকেছিল, তার একটা অংশ বামে ফেরা অবশ্যম্ভাবী। বিশেষত যেভাবে বিজেপি তৃণমূল ভাঙানোর খেলায় নেমেছে, এবং তার ফলে একদিকে তারা প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার ক্ষেত্রে নিজেদের বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে, অন্যদিকে আদি বনাম নব্য বিজেপি'র মারামারির ফলে তাদের সম্পর্কে রাজ্যবাসীর মোহভঙ্গ ঘটছে।

বামপন্থীদের ভোট বাড়লে এবং তারা রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিক হলে বলাই বাহুল্য যে, গণতান্ত্রিক পরিসর প্রসারিত হবে। আর গণতান্ত্রিক পরিসর প্রসারিত হলে নির্বাচনী রাজনীতির বৃত্তের বাইরে থাকা অন্যান্য প্রগতিশীল গণসংগঠনগুলিও নিজেদের রাজনৈতিক ভাষ্য নির্মাণের ক্ষেত্রে পায়ের তলায় শক্ত জমি পাবে।

লেখক ন্যাশনাল ইউনির্ভাসিটি অফ জুরিডিক্যাল সায়েন্সেস-এর অর্থনীতির অধ্যাপক

২০২১ বিধানসভা নির্বাচনে আর এস পি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে আকাশবাণীতে সম্প্রচারের জন্য সর্বানী ভট্টাচার্যের বক্তব্য

পশ্চিমবঙ্গের সুধী নাগরিকবৃন্দ

আর এস পি'র পক্ষ থেকে রাজ্যবাসীকে অভিনন্দন জানাই। আমরা জানি যে নির্বাচন গণতন্ত্রের উৎসব। কিন্তু আমাদের প্রতি মুহূর্তের অভিজ্ঞতা হল যে, এই গণতন্ত্রের মৌলিক বিষয়গুলি খেলা মেলার চাপে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। গণতন্ত্রের উৎসবে মানুষের প্রতি মুহূর্তের প্রয়োজন যে বিষয়গুলি যেমন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, খাদ্য সুরক্ষা, বাসস্থান ইত্যাদি নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের ভূমিকা কি তা জানতে চাওয়া মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার। কিন্তু আমাদের রাজ্যের নির্বাচনে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দলীয় তরজা ও দলবদলের রাজনীতিই মুখ্য। মানুষকে কোনো সুরাহা দিতে তারা উৎসাহীও নয়, ব্যর্থও বটে। আর জবাব দেওয়ার দায় তাদের নেই। প্রতিশ্রুতি রক্ষা যে গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান শর্ত একথা তারা মানেন না। বিজেপি ক্ষমতায় বসার পরই করপোরেট পুঁজিপতিরা এই দেশটাকে দখল করে বসেছে। ভারতে জাতীয় জীবনে এমন ঘোর দুর্দিন স্বাধীনতা উত্তরকালে আর কখনো আসেনি। দীর্ঘ সাত বছর ধরে একের পর এক চরম অনৈতিক সিদ্ধান্ত নিয়ে নিত্যনতুন যন্ত্রণা সৃষ্টি করে কেন্দ্রীয় সরকার। সরকারের প্রথম ও প্রধান অপচেষ্টা সংবিধানকে ধ্বংস করে একের পর এক জনবিরোধী সিদ্ধান্ত গ্রহণ। কৃষি নীতি, শিক্ষা নীতি, শ্রম কোড বিল সহ বেশকিছু প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে সংসদকে এড়িয়ে কারণ বিজেপি চেয়েছে তার সময়কালে বিরোধী কণ্ঠস্বরকে মুছে দিতে অথবা কণ্ঠস্বর থাকলে তাকে দেশদ্রোহী বলে দেগে দিয়ে জেলে পুরে দিতে।

২০২০ সাল থেকে অদ্যাবধি বিশ্বের ত্রাস করোনায় যখন দেশের অসংখ্য মানুষ অনিশ্চয়তায় ভুগছেন, মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছেন হাজার হাজার মানুষ। অপরিকল্পনা মাফিক লকডাউন এর ফলে কয়েক কোটির মতো কর্মরত মানুষ জীবিকা হারিয়েছে দেশের অর্থনীতিবিদরা যখন বলছেন দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে যদি মানুষের কর্মসংস্থান না হয়। তখন দেশের প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সরকার এ বিষয়ে নির্লিপ্ত রয়েছে।

আই এল ও এবং এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট এক যৌথ সমীক্ষা দেখাচ্ছে যে লকডাউন ও করোনার সংক্রমণ মোকাবিলায় একগুচ্ছ পদক্ষেপের কারণে ব্যবসার পথে অন্তরায় তৈরি হয়েছে তাতে আগামী দিন মাসে প্রায় ৪০ লক্ষ যুবক যুবতী বেকার হয়ে পড়বে। এই সমীক্ষায় আরও দেখা যাচ্ছে যে পুরুষের তুলনায় বেশি ২০২১ সালে ২৫ থেকে ৩০ বছর বয়সের মহিলাদের দারিদ্র্য ও বেকারী চরম সীমায় গিয়ে পৌঁছবে ফলে মহিলাদের অবস্থা আরো করুণ হতে থাকবে। এই সংকটের কারণে মেয়েদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজ নিতে হচ্ছে। শারীরিক দুর্ভোগ বেশি এমন কাজে মহিলা ও দলিতরা যোগ দিতে বাধ্য হচ্ছে একই সঙ্গে।

নতুন শ্রম কোড বিলে একইসঙ্গে দেশের মানুষের এই সংকটের সময় সরকার কাজের সময় বাড়িয়ে ১২ ঘণ্টা করতে চাইছে আট ঘণ্টার বদলে। একবিংশ শতাব্দীতে একটা মানুষকে ১২ ঘণ্টা কাজ করিয়ে নিতে চাওয়া এই সরকার কিন্তু লজ্জিত হয় না। মানুষ কিন্তু সবই দেখছে, মানুষই এর জবাব দেবে। একদিকে মানুষ যেমন কাজ হারাচ্ছে, নিঃস্ব হচ্ছে গরিব মানুষ তার চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে এই করোনা কালেই কয়েকটি পুঁজিপতির সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ১৩ লক্ষ কোটি টাকার মতো বেড়েছে। পশ্চিমবঙ্গবাসী কি এর জবাব চাইবে না। এই বৃদ্ধির নিশ্চয়তার লক্ষ্যে যে আত্মনির্ভর ভারত সরকার গড়তে চায় সেখানে রেল, খনি, বন্দর, দেশের লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা সব বেচে দিয়ে ব্যক্তি পুঁজির বৃদ্ধি ঘটিয়ে দেশটাকেই বেসরকারি করে দিতে চায়। সরকারি নিয়ন্ত্রণে ফসল বেচার কেন্দ্র মান্ডি ব্যবস্থা তুলে দিয়ে সবটাই ফড়েদের হাতে তুলে দিতে চায় মান্ডি ব্যবস্থা পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটলে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের দাবি অবান্তর হয়ে যাবে। কৃষকদের মরণপণ লড়াইকে ব্যর্থ করতে সরকার তাই উঠে পড়ে লেগেছে। মান্ডি না থাকলে শস্য সংগ্রহের পরিকাঠামোর বারোটা বাজিয়ে আত্মনির্ভর ভারত গড়ে উঠবে। আমরা মানুষের কাছে সেই প্রশ্ন রেখে যেতে চাই আমরা কি এই ফেরিওয়ালার আত্মনির্ভর ভারতের কথা বিশ্বাস করছি? একই সঙ্গে গণবন্টন ব্যবস্থা না থাকলে রেশন ব্যবস্থা মুখ থুবড়ে পড়বে, গরিব মানুষের দুর্দশা চরমে পৌঁছাবে। ফলে দিনে দিনে কর্পোরেটে পুঁজির চূড়ায় বসে পুঁজিপতিরা অগণিত মানুষের রক্তের বিনিময়ে ফুলে ফেঁপে উঠবে। আর আমাদের বলতে হবে আত্মনির্ভর ভারত জিন্দাবাদ।

এই সরকারের নতুন শ্লোগান ডবল ইঞ্জিন। অর্থাৎ কেন্দ্রে ও রাজ্যে একটাই সরকার আর তার নমুনা হলো ডবল ইঞ্জিন রাজ্য ইউ পি। যেখানে সংসদের প্রশ্নোত্তর পর্ব থেকে জানা যায় ২০১৯এ একবছরে ৫৯৮৪৫ জন ধর্ষিতা হয়েছে। এই অবস্থা আমাদের রাজ্যে কি আমরা আনবো? যদিও তৃণমূলের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ এখন ধর্ষণে দেশের মধ্যে তিন নম্বরে। ২০১৯ সালে এক বছরে রাজ্যে ধর্ষণ হয়েছে ৩০৯৯৪। এ চেহারা দেখলে শিউরে উঠতে হয়। আর সেই ধর্ষণে প্রথম যে রাজ্য তার মুখ্যমন্ত্রী এ রাজ্যে এসে মেয়েদের সুরক্ষার কথা যখন বলে তখন ওঁর লজ্জা হয় না কিন্তু আমাদের লজ্জা হয়।

আরেকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে চাই তা হল কোভিড অতিমারি ভারতীয় অর্থনীতির নিচের তলার প্রকৃত চেহারাটা স্পষ্ট করেছে যা সাধারণত প্রকাশিত হয় না ২০১১ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত প্রতিবারে ৮০ লক্ষ মানুষ এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে কাজের সন্ধানে পাড়ি দিয়েছে। কিন্তু এই পরিযায়ীরা নিজভূমে পরবাসী থেকে গেছে। স্বাধীনতার পরে এ ধরনের অর্থনৈতিক ও মানবিক সংকটের মুখোমুখি দেশ কখনো হয়নি।

যে দেশের সরকার বহু মানুষকে দেশদ্রোহী বলে জেলে আটকে রাখতে পারে সে দেশের সরকার পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুর সংখ্যা বলতে পারে না এ কথা ভাবতেও অবাক লাগে। কারণ এই পরিযায়ী শ্রমিকরা সরকারের চোখে redundant people ছাড়া আর কিছুই নয়। অন্যদিকে আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সততার প্রতীক থেকে দিদিকে বলো শ্লোগান দিয়ে সুবিধা করতে না পেরে এখন 'ঘরের মেয়ে' হয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল মানুষের জন্য যখন এতই করলেন তাহলে এই শ্লোগান দিতে হচ্ছে কেন? আর সরকারকেই বা দুয়ারে দুয়ারে যেতে হচ্ছে কেন? এই শ্লোগান এর মধ্য দিয়ে রাজ্য সরকারের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই প্রমাণ করেছেন যে তিনি যা বলছেন আর তিনি যা করছেন তাতে ভয়ঙ্কর পার্থক্য আর তাই তিনি ভয় পেয়েছেন।

আজ তিনি বিজেপি হঠাও স্লোগান তুলেছেন কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ভুলে গেছেন যে বাংলার যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে যে সিঙ্গুর প্রকল্প বামফ্রন্ট সরকারের তৈরীর প্রয়াস ছিল তাকে ধ্বংস করতেই বিজেপিকে সহায়ক শক্তি হিসেবে এ রাজ্যে ডেকে আনার ফলই আজ পশ্চিমবঙ্গবাসীকে ভুগতে হচ্ছে। আর এস এসের ১৪০০ শিক্ষা শিবির এ রাজ্যে তো তৃণমূলের সুপ্রিমোর আমলেই তৈরি হয়েছে। ৩৪ বছরে যে আর এস এস কলকাতায় একটিও সমাবেশ করতে পারেনি, এই সরকারের আমলে ১০ বছরের ৬টি সমাবেশ হয়েছে। এসব তো মানুষ ভুলে যায়নি। মানুষ ভুলে যায়নি এ রাজ্যে ধর্ষিতার মূল্য নির্ধারিত হয়। ১৯৯৮ সালে যে বিষবৃক্ষ রোপন করেছিলেন তা বিষফলই তৈরী করেছে ফলে স্বভাবতই আজকের সরকারের কাছে তা যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১০ বছরের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সময়কালে এ রাজ্যের চেহারা কি হয়েছে তা দেখা যাক। আমরা জানি এই করোনার সময়ে কাজ হারিয়েছে মানুষ ভয়ংকরভাবে। সেই কাজ মানুষ ফিরে তো পাইনি বরং এই মুহূর্তে আমাদের রাজ্যে কয়েক লক্ষ সরকারি পদ পূরণ হয়নি। কিছু চুক্তিতে বা ঠিকা চাকরি হয়েছে কিন্তু তাদের চাকরির কোনো নিরাপত্তা নেই। শিক্ষক নিয়োগও হয়নি। কিন্তু হাজার হাজার ক্লাবকে লক্ষলক্ষ টাকা অনুদান দিয়ে নিয়মিত রোজগার বঞ্চিত যুব সম্প্রদায়কে অনৈতিক কাজে ব্যবহার করেছে তৃণমূল সরকার। এই আমলে ব্যাপক দুর্নীতি। সারদা, নারদার দুর্নীতি দিয়ে শুরু তারপর আমফানের দুর্নীতি। এছাড়া কয়লা মাফিয়া, বালি মাফিয়া, গরু পাচারকারী, সমাজবিরোধীদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। ২০১৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনের মধ্য দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের সন্ত্রাসের চেহারাটা রাজ্যের মানুষ দেখেছে। সেই সন্ত্রাস আর দুর্নীতির ফাঁক গলিয়েই এই রাজ্যের বিজেপির মতো একটি মিথ্যাচারী দুর্নীতিগ্রস্ত, দেশদ্রোহী দল ক্ষমতায় আসতে চাইছে। এরাজ্যের বিধানসভা ভোটে বিজেপি ও তৃণমূল উভয়কেই পরাজিত করতে হবে।

আজকের এই কঠিন সময়ে বামপন্থী জোটই কেবল আনতে পারে এক বিকল্প নীতি। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকল্প কেবল বামপন্থী শক্তি আনতে পারে। আমরা পশ্চিমবঙ্গবাসী শুধু একথাই বলতে পারি যে, অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে ভয়াবহ গহ্বর ও রাজনীতির ক্ষেত্রে যে অন্ধকার কেন্দ্রের শাসক সরকার নামিয়ে এনেছে সে কোন বিকল্প পশ্চিমবঙ্গবাসীকে দিতে পারবে না। তৃণমূলের মতো অপশাসকও কখনো কোনো অঙ্গরাজ্যে আসেনি। যে গণতান্ত্রিক প্রশাসক মানুষের সমস্যাকে ন্যূনতম মোকাবিলা করতে পারে পারে না। তার ভোট চাইবার অধিকারও থাকা উচিত নয়।

আর এস পি বিশ্বাস করে মানুষ ইতিমধ্যেই বুঝতে পেরেছে তৃণমূল ও বিজেপি'র আসল চেহারা। তাদের কাজ কেবল ক্ষমতায় টিকে থেকে নিজেদের সম্পত্তি বাড়ানো। নীতি, আদর্শ, মানুষের ভালে কোনটাই তাদের লক্ষ্য নয়। তাহলে এভাবে দলবদল হত না। বামপন্থীদের লড়াই কাজের লড়াই, ভাতের লড়াই, মজুরির লড়াই। রাজ্যের মানুষ যাতে মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারে তার লড়াই। জাত ধর্ম নয়, মনুষ্যত্বের প্রশ্নই সেখানে বড় কথা। রাজ্যের যে স্বৈরাচারের বাতাবরণ ও কেন্দ্রের সরকারের যে ফ্যাসিবাদী উত্থান তা মুক্ত চিন্তার প্রকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে তার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিকল্প নীতির উপর ভিত্তি করে নতুন পশ্চিমবঙ্গ গড়ে তুলতে পশ্চিমবঙ্গবাস বামফ্রন্ট মনোনীত সংযুক্ত মোর্চার সমর্থিত আর এস পি প্রার্থীদের জয়যুক্ত করবেন। এই আহ্বান জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার।

বামফ্রন্টের নির্বাচনী ইস্তাহার

প্রকাশিত হয়েছে — দাম ৫ টাকা

কর্পোরেট স্বার্থে তৃণমূল ও বিজেপি'র ঘৃণ্য চক্রান্ত রুখতে মানুষের স্বার্থে বামগণতান্ত্রিক ঐক্য সুদৃঢ় করুন

প্রকাশিত হয়েছে — দাম ১০ টাকা

বামপন্থা-সেকাল একাল

—মনোজ ভট্টাচার্য

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে

—— দাম ১৫ টাকা——

অবিলম্বে সংগ্রহ করুন

বিধানসভা নির্বাচনে আর এস পি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে বক্তব্য দূরদর্শনে সম্প্রচারের জন্য আর এস পি রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অশোক ঘোষ-এর বক্তব্য

সুধী নাগরিকবৃন্দ,

আর এস পি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে আপনাদের শুভেচ্ছা জানাই। কঠিন আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন হতে চলেছে। অর্থনীতি আজ মন্দার কবলে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় লাভের গুড় যেমন কয়েকজন ধনকুবের পায়, তেমন মন্দার ফল ভোগ করে আমজনতা। তাই আজ ১ শতাংশ ধনকুবেরের পাহাড়প্রমাণ সম্পদ বৃদ্ধির পাশাপাশি অনাহার, অর্ধাহার, দারিদ্রে দিন কাটাচ্ছে দেশের কোটি কোটি মানুষ। এই রাজ্যের চিত্রও দেশের থেকে আলাদা নয়। শ্রম বনাম পুঁজির দ্বন্দ্বে রাজ্য ও কেন্দ্র দুই সরকারই পুঁজির পক্ষে কাজ করছে। সরকারের নীতিতে বেকারের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। নতুন কাজের সুযোগ সৃষ্টির বদলে চলছে শ্রমিক ছাঁটাই। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের দপ্তরগুলিতে লক্ষ লক্ষ শূন্য পদে নিয়োগ মানা হচ্ছে না। রাজ্যে শিক্ষক সহ বিভিন্ন পদে নিয়োগের পরীক্ষা নিয়মিত হচ্ছে না, নিয়োগে চলছে চরম অনিয়ম। কেন্দ্র ও রাজ্য দুই সরকারই স্থায়ী কর্মী নিয়োগ বন্ধ করতে চায়। রাজ্যে শ্রমিকদের কাজের নিশ্চয়তা ও অধিকার বিপন্ন। কেন্দ্রীয় সরকার শ্রম আইনগুলি বাতিল করে শ্রমবিধির মাধ্যমে অবাধে শ্রমিক ছাঁটাই, কম মজুরিতে বেশ সময় শ্রমিককে খাটানোর অধিকার মালিককে দিয়েছে। দুটি সরকারই পুঁজির স্বার্থে শ্রমের বাজার সস্তা করতে চায়। দেশের ৯০ শতাংশেরও বেশি শ্রমিক অসংগঠিত ক্ষেত্রে যুক্ত। রাজ্য সরকার অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের কাজ ঠিক মতো করছে না। কেন্দ্রীয় সরকারও তাদের সামাজিক সুরক্ষাগুলি কেড়ে নিতে চাইছে। আশা, আই সি ডি এস সহ বিভিন্ন প্রকল্পের কর্মীরা আজও সরকারি কর্মীর স্বীকৃতি পান নি। অন্য রাজ্যে কাজ করতে যাওয়া শ্রমিকদের প্রতি দুই সরকারেরই উদাসীনতা লকডাউনের সময়ে পরিষ্কার হয়েছে। সরকারের এই নীতি বদলাতে এবারের বিধানসভা ভোটে সংযুক্ত মোর্চা সরকার প্রয়োজন। যে সরকার প্রতি বছর চাকরির পরীক্ষা নেবে, মেধার ভিত্তিতে প্রতিটি শূন্য পদে নিয়োগ করবে। ন্যূনতম দৈনিক মজুরি বৃদ্ধি, অসংগঠিত শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা সুনিশ্চিত, বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের ভাতা বৃদ্ধি এবং পরিযায়ী শ্রমিকদের স্বার্থে পৃথক মন্ত্রক তৈরি করবে। অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজের সুযোগ সৃষ্টি করবে।

অন্নদাতা কৃষকরা আজ বিপন্ন, বেড়ে চলেছে কৃষক আত্মহত্যা। রাজ্যের কৃষকরা ফসলের দাম পাচ্ছে না, সরকারও কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। বীজ, সার সহ প্রতিটি জিনিসের দাম বাড়ায় রাজ্যের কৃষকরা আজ দেনার দায়ে ডুবতে বসেছে। রাজ্যে অধিকাংশ ফসলের ক্ষেত্রেই ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ঘোষণা করে কৃষকের থেকে সরাসরি ফসল কেনার সরকারি ব্যবস্থা নেই। কৃষক বাজার অর্থনীতির অসহায় শিকার। সরকারের পক্ষ থেকে ফসল কেনার যেটুকু ব্যবস্থা রয়েছে তাও ত্রুটিপূর্ণ। সরকারি ঘোষণা মতে সব ব্লকে কিষাণ মান্ডি হয় নি। যেখানে হয়েছে সেখানেও কৃষকরা বিশেষ উপকৃত হচ্ছে না। রাজ্য সরকার ২০১৪ ও ২০১৭ সালের আইনের মাধ্যমে কৃষকদের বিপন্ন করে কৃষিতে পুঁজি অনুপ্রবেশের পথ সুগম করেছে। কৃষক দেনার দায়ে জমির মালিকানা হারাচ্ছে, জমির পাট্টা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। গত বছর কেন্দ্রীয় সরকার তিনটি কৃষি আইনের মাধ্যমে সমগ্র কৃষিব্যবস্থায় কর্পোরেট আগ্রাসনের পথ মসৃণ করেছে। আগামীদিনে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ফসল কেনার সরকারি ব্যবস্থাই উঠে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। কেন্দ্রীয় কৃষি আইনের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলন চলছে। দুটি সরকারই স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশ মানছে না। কৃষিক্ষেত্রে পুঁজির দাপটে গ্রামীণ অর্থনীতি আজ গভীর সঙ্কটে। বাড়ছে গ্রামীণ বেকারত্ব। সংযুক্ত মোর্চা কেন্দ্রীয় কৃষি আইন এরাজ্যে কার্যকরী না করতে দেওয়া ও রাজ্য সরকারের কৃষক বিরোধী আইন বাতিলে দায়বদ্ধ। সংযুক্ত মোর্চা সরকার মানে কৃষকের ফসলের অভাবী বিক্রি বন্ধ করে খরচের দেড়গুণ দাম পাওয়ার নিশ্চয়তা, জমির পাট্টা পাওয়া, কৃষি ও ফসল বিপণনে সমবায় ব্যবস্থাকে গুরুত্ব দেওয়া। সংযুক্ত মোর্চা সরকার মানে অন্নদাতার অন্নের নিশ্চয়তা। রাজ্যে রেগা প্রকল্পে চলছে দুর্নীতি। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ বরাদ্দ কমিয়ে রেগা প্রকল্প তুলে দিতে চাইছে। সংযুক্ত মোর্চা রেগা প্রকল্পে বছরে অন্তত দেড়শো দিনের কাজ, মজুরি বৃদ্ধি এবং শহরেও এই প্রকল্প চালু করতে।

বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে পেছনের সারিতে থাকা এদেশের প্রতিটি নাগরিকের পেটভরা, পুষ্টিকর খাবারের ব্যবস্থা করা সরকারের দায়িত্ব। সংযুক্ত মোর্চা সরকার মানে ২ টাকা কেজি দরে মাসে পরিবার পিছু ৩৫ কেজি চাল বা আটা, বাজার থেকে কম দামে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহের ব্যবস্থা।

রাজ্যের অধিকাংশ মানুষের আয় কমছে, জিনিসের দাম বাড়ছে। রাজ্য সরকার দাম নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা নিচ্ছে না। অত্যাবশ্যকীয় পণ্য নিয়ন্ত্রণ আইন বদলে কেন্দ্রীয় সরকার কালোবাজারি ও মজুতদারিকে অবাধ করেছে। খাদ্যদ্রব্যের দাম বেড়ে চলেছে। কেন্দ্রের নীতিতে পেট্রল, ডিজেল, কেরোসিন, রান্নার গ্যাসের দাম বাড়ছে। তৃণমূলের আমলে রাজ্যে বিদ্যুতের দাম বহুগুণ বেড়েছে। কেন্দ্রের নয়া বিদ্যুৎ আইনে বেসরকারিকরণ ও দাম বৃদ্ধির ব্যবস্থা হয়েছে। সংযুক্ত মোর্চা সরকার মানে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা, ২০০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিলে ভর্তুকি।

করোনা অতিমারি প্রমাণ করেছে যে, সরকার স্বাস্থ্য পরিষেবার দায়িত্ব না নিলে, স্বাস্থ্যের বেসরকারিকরণ উৎসাহিত হলে মানব সভ্যতাই বিপন্ন হবে। সরকারি উদ্যোগে জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন প্রয়োজন। অথচ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার জনস্বাস্থ্যকে অবহেলা করে, বীমার মাধ্যমে বেসরকারি সংস্থাগুলির লাভের সুযোগ করে দিচ্ছে। সংযুক্ত মোর্চা চায় জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থায় সরকারি উদ্যোগ, বিনামূল্যে সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং ওষুধের দাম নিয়ন্ত্রণ। বন্ধুগণ, নীতির প্রশ্নে তৃণমূল ও বিজেপি'র মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। সংযুক্ত মোর্চা সরকার মানে দলবদলের খেলা নয়, নীতি বদলের লড়াই। জাতের লড়াইকে পরাস্ত করে রুটি রুজির লড়াইকে শক্তিশালী করতে আসন্ন বিধানসভায় নির্বাচনে আর এস পি প্রার্থীদের কোদাল ও বেলচা চিহ্নে এবং রাজ্যের প্রতিটি কেন্দ্রে বাম-কংগ্রেস-ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি নিয়ে গঠিত সংযুক্ত মোর্চার প্রার্থীদের ভোট দিয়ে জয়ী করার জন্য আর এস পি'র পক্ষ থেকে আপনাদের আবেদন জানাচ্ছি। ধন্যবাদ।

বিধানসভা নির্বাচন ২০২১ উপলক্ষে আকাশবাণী এবং দূরদর্শনে আর এস পি নেতা প্রমথেশ মুখার্জীর বক্তব্য

গত দশ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে একটা সরকার চলে আসছে। লুম্পেন নির্ভর নৈরাজ্যবাদী তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে সেই সরকার তৈরি হয়েছে। দিশাহীন ও মাফিয়াদের নিয়ে তৈরি সেই রাজত্ব সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ, গণতন্ত্র এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে পারেনি। সাম্প্রদায়িকতা, নারী নির্যাতন ভয়াবহ আকার নিয়েছে। কল্পনাতীত বেকারত্ব সমস্যার সামান্যতম মোকাবিলাও করতে পারেনি। গ্রাম-শহরে দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়াতে অস্বীকার করেছে। প্রশাসন ও নাগরিক জীবনে সীমাহীন দুর্নীতি এই সরকার সামাল দিতে পারেনি। তৃণমূল কংগ্রেস বস্তুত দুষ্কৃতী নির্ভর দল।

এবারের নির্বাচনে, একদিকে বিজেপির ফ্যাসিবাদ, অপরদিকে তৃণমূলের নৈরাজ্যবাদী পথ ছাড়া জনজীবনের সামনে তৃতীয় ধারার এক জোটশক্তি বিকশিত হচ্ছে। বাম-কংগ্রেস-আই এস এফের নেতৃত্বে সমাজের বঞ্চিত মানুষের জন্য আর একটি জোটশক্তি সংগঠিত হয়েছে। সে জোটের আবেদন, মানবিক এবং মর্মস্পর্শী। তৃণমূলের খেলা হবে, বিজেপি'র বিকাশ হবে, তার পাশাপাশি এই জোটের ডাক কর্মক্ষম বেকার যুবক-যুবতীদের চাকুরি হবে, দেশে হাসপাতাল হবে, পারস্পরিক বিশ্বাস সম্প্রীতি ও গণতন্ত্র বাঁচবে। পশ্চিমবঙ্গে সংযুক্ত মোর্চার এই ডাকের আবেদন একান্তভাবেই মানবিক। বামপন্থী নেতারা বলছেন, পশ্চিমবঙ্গের সংযুক্ত মোর্চার কাজ কেবল নির্বাচনী সংগ্রামের মধ্যেই সীমিত থাকবে না, তা আগামীদিনে আরও প্রসারিত হবে। শ্রেণি ও সামাজিক শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে।

ঐতিহাসিক কালে বামপন্থীরা তাদের ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—সেই বার্তা তাঁরা ব্রিগেডে পরিচ্ছন্ন ও দৃঢ়ভাবে দিয়েছেন। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, গত কয়েক বছরে পঞ্চাশটি কর্পোরেট সংস্থাকে হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণদান এবং তাদের বিভিন্ন কর মকুব করা হয়। ঋণখেলাফি, ঋণ মকুবের ফলে ব্যাঙ্কে অনুৎপাদক সম্পদ বৃদ্ধি পেয়ে ক্রমেই দেউলিয়া হয়ে পড়ে। জাতীয় ব্যাঙ্কিং অর্থনীতি বিপন্ন হতে থাকে। বিজেপি'র নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার ভারতের কর্পোরেট কোম্পানিগুলির স্বার্থে অর্থনীতিকে এইভাবে রুগ্ন করে তোলে। একইসাথে নতুন কৃষি আইনে কৃষির কর্পোরেটকরণ করা হচ্ছে। রেলের বেসরকারিকরণ করা হচ্ছে। প্ল্যানিং কমিশন অনেক আগে তুলে দিয়ে পুঁজিপতিদের স্বার্থবাহী নীতি আয়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর দ্বারা দরিদ্র মানুষের ন্যূনতম উপকার হতে পারে না। কর্মক্ষম যুবক-যুবতীদের সামনে কাজের সুযোগ নেই। শিক্ষা, জন-স্বাস্থ্য, জনমুখী অর্থনীতির কোনও চিহ্নই নেই। ভয়াবহ করোনার মোকাবিলা করার জন্য যে বিজ্ঞানসম্মত পথ অবলম্বন করা উচিৎ ছিল তা, আদৌ হয়নি। আবার রাজ্যে রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। কোভিশিল্ড কোভ্যাক্সিন অপ্রতুল, সকলের কাছে দ্রুত পৌঁছে দেওয়া যাচ্ছে না। ডিজেল-পেট্রোল- রান্নার গ্যাস সহ সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে। অন্য দেশে পেট্রোপণ্যের দাম কমছে, আর আমাদের দেশে দাম আকাশচুম্বী হচ্ছে। এই হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারি পরিকল্পনা এবং বাজার অর্থনীতির ভয়াবহ রূপ।

সর্বোপরি ভারতে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং জনজীবন নৃশংসভাবে আক্রান্ত, বিপর্যস্ত আর্থিক নীতিসমূহ, ভয়াবহ বেকার সমস্যা, নারী জাতির ওপর আক্রমণ ও নির্যাতন লজ্জাজনক, ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা বিপন্ন, বৈদেশিক নীতি পরিবেশ সম্পর্কিত ভাবনাসমূহ দুর্বল ও আপসমুখী। ভ্রান্ত, অপরিমাণদর্শী নীতি থেকে দুর্ভিক্ষের উদ্ভব হয়। মনে রাখতে হবে, দুর্যোগ প্রকৃতির সৃষ্টি, কিন্তু দুর্ভিক্ষের স্রষ্টা দেশ ও রাজ্যের সরকার এবং তৃণমূলের ন্যায় দলগুলি। তৃণমূল কংগ্রেসের ইস্তাহার প্রকাশিত হয়েছে। সেই ইস্তাহার মানুষকে হতাশ করেছে। মাসখানেক আগে ৩২ বছরের যুবক মইদুল ইসলাম মিদ্যা নবান্নে ছাত্র-যুব সংগঠনের ডাকে কাজের দাবিতে মিছিল করতে গিয়ে পুলিশের লাঠির নির্মম আঘাতে প্রাণ দেয়, এই ঘটনা প্রমাণ করে গত দশ বছরে তৃণমূলী শাসনে পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র কেমন চলছে এবং বেকার ছেলে-মেয়েদের কাজের সুযোগ, কোন অবস্থায় আছে। তার সঙ্গে পার্শ্ব শিক্ষকদের ধারাবাহিক আন্দোলন সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রীর মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী কেমন তা জানা যাচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গে সরকারি পরিকল্পনায় কোন গঠনমূলক উদ্যোগ দেখা যায় না। শুধুই 'আপাত সুবিধাভোগী' তৈরির উন্নয়ন দেখা যায়। দুর্গাপূজা, ক্লাবকে অনুদান, মাটি উৎসব, আম-উৎসবে কোটি কোটি টাকা খয়রাতি দেওয়া হয়। সেই কাজের মধ্য দিয়ে অনুগৃহীত মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। যুবশ্রী-কন্যাশ্রী-রূপশ্রী-সবুজ সাথীকে এই ধরনের বিজ্ঞাপন খাতের শ্রেণিভুক্ত করা হয়। বেকার যুবকদের বেকারত্বের অবসানের কর্মসূচি গৃহীত হয় না। অনেক স্কুলে ছাত্রীদের শৌচাগার নেই। স্কুলের কাঠামোগত উন্নয়ন না করে বিজ্ঞাপনধর্মী কাজে দেশের ব্যয় প্রকৃত উন্নয়নকে চিহ্নিত করে না।

এইসব প্রক্রিয়ায় কোনও কার্যকরী বিকাশ ঘটে না। স্কুলছুট, অপ্রাপ্ত বয়সে বিয়ে, নারী নির্যাতন বৃদ্ধির ঘটনা এতে প্রকট হয়। ধর্মীয় ও জাতি বিভাজনে ইমাম-মোয়াজ্জেম ভাতা, পুরোহিত ভাতা এমনকি, সম্প্রদায়ভিত্তিক বার্ধক্যভাতা সমস্যা বৃদ্ধি করে। পশ্চিমবঙ্গে গুনীজনের সম্মান কিন্তু আদতে বুদ্ধিজীবী বিদ্বজ্জনদের মধ্যে অনুগ্রহভাজন তৈরির প্রয়াস করা হয় মাত্র। শিক্ষা সংস্কৃতিকে উন্নয়নের মোড়কে রাজনীতিকরণের এক অনন্য নজির এই জমানাতে তৈরি হয়েছে। বেলাগাম খরচের হিসাব রাজ্য সরকার সি এ জি-কে দেয় না। তৃণমূলের সুবিধাভোগী তৈরির উন্নয়ন মডেল তাই নিম্নবর্গের সার্বিক বিকাশের কোনও মডেল হতে পারে না—তা তাঁদের বিকাশের পথে মস্ত বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার। তা ক্রমাগত হরণ করে ব্যক্তি নেতা-নেত্রীর শিক্ষার ওপর নির্ভরশীল জীবন কখনো সম্মানের হতে পারে না। তৃণমূল কংগ্রেস এমন অমানবিক অপরাধ করেই চলেছে।

মানুষের প্রয়োজন সর্বজনীন উন্নয়ন। উৎসব-মেলা-ক্লাবের উন্নতিতে দান-খয়রাতি করে অনুগ্রহভাজন কিছু ব্যক্তি বা গোষ্ঠী গড়ে তুলতে মানুষ চায় না। মানুষ চায় ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। ইমাম-মোয়াজ্জেন ভাতা—পুরোহিত ভাতার বিলোপ এবং সব ক্ষেত্রে যোগ্য ব্যক্তিকে উৎসাহপ্রদান। মনে রাখতে হবে, ছাত্র-যুবরা এই সরকারকে 'লালকার্ড' দেখিয়েছে. এবার দেশের অগণিত মানুষ এই অপদার্থ সরকারকে 'লালকার্ড' দেখাবে। সেদিন খুব বেশি দূরে নয়।

আমাদের কাছে চরম উৎকণ্ঠার বিষয়, তৃণমূল কংগ্রেসের চূড়ান্ত অনৈতিকতা এবং দুর্নীতির উৎকট প্রকাশ বিজেপি'র মতো একটি হিংস্র সাম্প্রদায়িক দলকে পশ্চিমবঙ্গে স্থান করে দেওয়া। তৃণমূলই এইরাজ্যে বিজেপিকে হাত ধরে নিয়ে এসেছিল। দীর্ঘ বহুকাল এই উগ্র সাম্প্রদায়িক দলটির সঙ্গে মিলিতভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের সুযোগ সুবিধা নিয়েছে। এখন সেই বিজেপি'ই সরাসরি পশ্চিমবঙ্গের সর্বনাশ করতে উদ্যত। তাদের পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের উৎকট আচরণ এবং দেশের সামূহিক সর্বনাশ সাধনে নিন্দাই ভূমিকা সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনার সুযোগ নেই। দেশের অপূরণীয় ক্ষতি করে চলেছে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার। বাস্তবে লক্ষ করা যায় যে, তৃণমূলের দুর্নীতিগ্রস্ত অমানবিক কুকর্মে সিদ্ধ বহু নেতাই এখন বিজেপি'র সম্পদ।

তৃণমূল কংগ্রেস দলটি যেমন দেশের সংবিধান সম্পর্কে অবহেলার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলে বিজেপিও অনেকাংশে সংবিধান উপেক্ষা করেই চলছে। অসহিষ্ণুতা ও পারস্পরিক অবিশ্বাসের প্রসার ঘটিয়ে দেশের জনজীবনকে বিপদগ্রস্ত করে তুলেছে। এই দুটি দল একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। মূলগতভাবে কোনো পার্থক্যই নেই।

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গবাসীকে অত্যন্ত সচেতন এবং দৃঢ় প্রত্যয়সহ এই দুই অপশক্তিকেই প্রতিহত করতে হবে। আমাদের বিনীত আবেদন, রাজ্যের সর্বজনীন স্বার্থপূরণে বিশেষ করে কর্মসংস্থানের প্রশ্নে, গণতান্ত্রিক অধিকার পরিব্যাপ্ত করতে এবং চলমান নৈরাজ্যজনক পরিবেশ থেকে মুক্তি পেতে সমস্ত কেন্দ্রে সংযুক্ত মোর্চা প্রার্থীদের সমর্থন করুন। জয়ী করুন। রাজ্য ও দেশকে বাঁচাতে এ ভিন্ন কোনো গত্যন্তর নেই। দেশের শ্রমজীবী মানুষের সংহতি ও সম্প্রীতি ধ্বংস করার চক্রান্ত রুখতেই হবে। মানবিকবোধের জয় নিশ্চিত করতে হবে।

Vol. 68 Issue No. 32 শনিবার ৩ এপ্রিল ২০২১ আট
RN No. 2710/57 Rupees Two [By Air Rs. 2.10]
Phone : 2229-4653; e-mail : kranti.press@yahoo.com

আর এস পি সহ সংযুক্ত মোর্চার প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচার

বালুরঘাটে সংযুক্ত মোর্চার প্রার্থীদের নমিনেশন পেশ এবং মহামিছিল।

বোলপুরে মানুষের কাছে নির্বাচনী প্রচারে কম. তপন হোড়।

চা-বাগানে শ্রমিকদের মাঝে কুমারগ্রামের আর এস পি প্রার্থী কম. কিশোর মিনজ্।

বাসন্তীতে বিশাল জনসভায় ভাষণরত আর এস পি'র প্রার্থী কম. সুভাষ নস্কর।

মাদারীহাট কেন্দ্রে আর এস পি'র প্রার্থী কম. সুভাষ লোহারের সমর্থনে নির্বাচনী প্রচার।

জঙ্গীপুর কেন্দ্রে আর এস পি'র প্রার্থী কম. প্রদীপ নন্দীর নমিনেশন পেশ।

সি পি আই (এম) প্রার্থী কম. দেবদূত ঘোষের সমর্থনে ভাষণরত কম. নওফেল মহ. সফিউল্লার ভাষণ।

ভরতপুর কেন্দ্রে সংযুক্ত মোর্চার প্রার্থীর সমর্থনে আর এস পি'র মিছিল।

মাদারিহাটে প্রার্থী কম. সুভাষ লোহারের প্রচারে ইউ টি ইউ সি'র রাজ্য সম্পাদক কম. দীপক সাহা।

পানিহাটিতে সংযুক্ত মোর্চার প্রার্থীর সমর্থনে নির্বাচনী প্রচার।

Printed and published by Manoj Bhattacharya from Kranti Press, 37 Ripon Street, Kolkata-700 016, Editor : Manoj Bhattacharya of behalf of RSP (Website : www.ganavarta.com)
Price Rs. 2/-